অলকনন্দা-সিরিজ ৬

শরৎ-সাহিত্য-ভবন

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
ভাদ্র—১৩৫২

এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশরৎচন্দ্র পাতাইত
ক্রাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, চৌধুরী লেন, কলিকাতা

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীমনোজ বসু

—

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ তারাপদ রায়চৌধুরীর

কর-কমলে—

ওপর থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, দ্বারোয়ান, দ্বারোয়ান, গেট বন্ধ কর শীগ্‌গির!

ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্ ক'রে গেট টানার শব্দ হ'লো। তারপর তাতে চাবি লাগিয়ে দিয়ে, দ্বারোয়ান তার বড় লাঠিটা বাগিয়ে ধ'রে চললো ওপরের দিকে।

সমস্ত একতলাটা ছুটতে ছুটতে সে একবার দেখে এলো—তারপর দু'তলা, তারপর তিনতলা এবং সর্ব্বশেষে চারতলা।

কিন্তু কোথাও চোরের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

বাড়ীতে মেয়েদের ভীড়ই তখন বেশী। পুরুষরা সব যে-যার কর্ম্মস্থলে গেছে। তবু যে-যার নিজেদের মহলগুলো তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলো—কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না।

তখন একজন বৃদ্ধা মন্তব্য করলেন, ও বাড়ীওলার ছোট-মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, হয়তো ও ঘুমতে ঘুমতে স্বপ্ন দেখেছে!

তাই হবে। দোতলার ঘোষ-গিন্নী বললে, তা' নাহ'লে দিন-দুপুরে এত ঘর থাকতে—এত লোক থাকতে ওই একফোঁটা দশ বছরের মেয়ে চেরীর কাছেই বা চোর যেতে যাবে কেন!

তখন একটা হাসির রোল উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরতলা ছাড়া
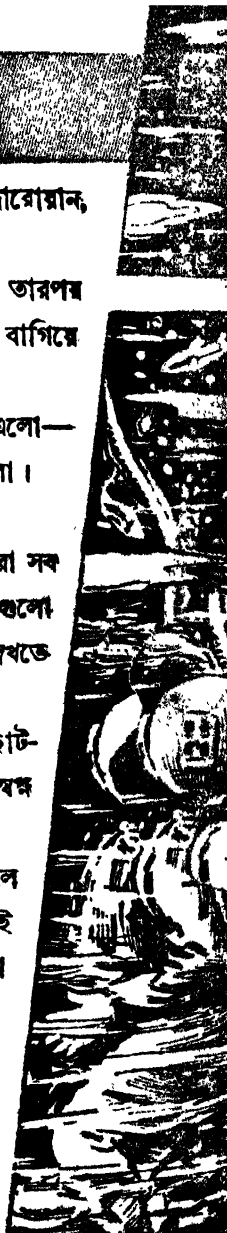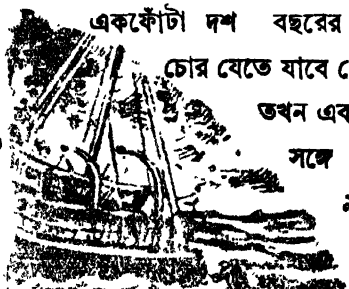
নীচের বাকি তিনটি তলার সকলেই একবাক্যে মেনে নিলে যে, চোর আসেনি এবং আসতে পারে না—ও বড়লোকের মেয়ের খেয়াল···ঘুমতে ঘুমতে রাজকন্যে স্বপ্ন দেখেছেন—

আর একফোঁটা একটা মেয়ের কথায় বিশ্বাস ক'রে দিবানিদ্রা ছেড়ে উঠে আসাই যে তাদের আহাম্মুকি হয়েছে—একথাও সেই সঙ্গে সবাই স্বীকার ক'রে নিয়ে আবার যে-যার ঘরে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করলে।

শুধু ওপরতলায় চেরীর মা'র চোখে ঘুম ছিল না। তিনি মেয়েকে ডেকে ধমকাচ্ছিলেন, মিছে কথা বলতে শিখেছিস্ এর মধ্যে! কেন তুই এতগুলো লোকের সামনে মিছিমিছি আমার মুখ হাসালি···বল সত্যি ক'রে···ঠিক কাউকে দেখেছিলি, না, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিস্?

মায়ের এই ধমকানিতে চেরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। সে বললে, আমি বুঝি মিছে কথা বলেছি—দেখলুম ত' আমার মাথার কাছে দাড়িগোঁফওলা একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা আমি কি করবো। তারপর মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলে বললে, তুমি যে-দিব্যি গালতে বলবে, আমি তাই গালতে পারি—

—তাই যদি হবে ত' গেল কোথায় লোকটা? তুই ছাড়া বাড়ীর আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না?

চেরী বললে, তারা যদি দেখতে না পায় ত' আমি কি করবো!

—তুমি কি করবে জানিনা, তবে তোমার জন্যে লোকের কাছে যে আমার মুখ দেখানো ভার হ'লো। এই ব'লে ক্রুদ্ধ-মূর্ত্তিতে তিনি জোরে জোরে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

চেরী বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

তার মা ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, আর ঢঙ্‌ ক'রে কাঁদতে হবে না, এখন যাও, ঘরে গিয়ে শোওগে—

চেরী তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সেখানে তেমনি-ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

তিনি আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন, দেখ চেরী, আমায় জ্বালাসনি :বলছি—তাহ'লে উনি অফিস থেকে এলে সব ব'লে দেবো—

এইবার ভাল ক'রে চোখের জল দু'হাত দিয়ে মুছে মুছে শুকিয়ে ফেলে চেরী তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু যেই ঘরে পা দিয়েছে, অমনি সেই ঘরে যে সিন্দুকটা ছিল তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো সেই গোঁফ দাড়িওলা মূর্ত্তি!

সঙ্গে সঙ্গে আবার চেরী 'চোর' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল এবং তার মা ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বললেন, কই, চোর কোথায়?
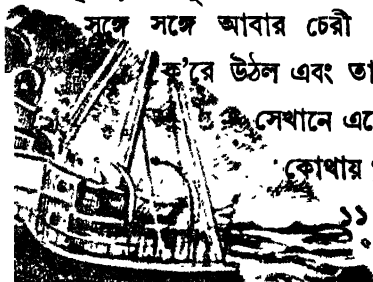
চেরীর সর্ব্বশরীর তখন ভয়ে কাঁপছে। সে আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়ে দিলে সেই স্থানটা।

চেরীর মা তাড়াতাড়ি সিন্দুকের পাশে যেতেই সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালো একটি বছর-দশেকের ছেলে।

তরুণ? তুই?

তরুণ বললে, হ্যাঁ, দিদিমা।

তিনি বললেন, তবে চেরী যে বলছিল, দাড়িগোঁফওলা একটা লোক?

তরুণ তখন হাসতে হাসতে কতকগুলো পরচুলা নীচে থেকে তুলে তাঁকে দেখালে।

রাগে চেরীর মা'র সর্ব্বাঙ্গ তখন রি-রি ক'রে উঠল। তিনি ঝেঁজে উঠে বললেন, এমনি ক'রে মানুষকে নিয়ে রগড় করে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!···বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙিয়ে, ছুটোছুটি করিয়ে···এর নাম খেলা? আচ্ছা, আসুন আজ উনি অফিস থেকে, তখন তোমার শিক্ষা ভালো ক'রে হবে'খন।

তরুণ কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললে, চেরী যে আমাকে দেখে ভয়ে এরকম ক'রে চেঁচিয়ে উঠবে তা' আমি [illegible] ক'রে জানবো!

বুড়ো দামড়া হয়েছিস্, আর এটুকু বুঝিস্না যে, দাড়িগোঁফ পরলে

ও তোকে কি ক'রে চিনবে? তারপর একটু দম নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর ওই পরচুলগুলো তুই পেলি কোথায়? চুরি করেছিস ত'?

তরুণ খপ্ ক'রে মুখে একটা দিব্যি গেলে বললে, না, চুরি করিনি—মোহনসিং আমাকে দিয়েছে।

মোহনসিং দিয়েছে! কেন তুই আবার তার কাছে গিয়েছিলি? কতবার না তোকে বারণ করেছি যে, ওসব ছোট-লোকদের সঙ্গে মিশবিনা, ওদের ঘরে যাবিনা? এই ব'লে তিনি কতকটা আপন মনেই বকতে লাগলেন, আচ্ছা ছোটলোক-ঘেঁষা ছেলে ত'! সারা দুপুর কেবল ওদের কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াবে? না বাপু, আমি আর পারি না—এর চেয়ে তোমরা মায়ে-বেটায় বিদেয় হও—আমি নিশ্চিন্ত হই। অবস্থা খারাপ, খেতে পাচ্ছিলিনা ব'লে আমি ব'লে ক'য়ে তোদের রাখালুম—আর তুই যদি রোজ রোজ এইরকম ক'রে জ্বালাতন ক'রে মারিস তাহ'লে ত' আর পারি না। এই বলতে বলতে তিনি নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

তরুণের মা চেরীদের বাড়ীতে রান্না করে। তরুণ রাঁধুনীর ছেলে হ'লেও চেরীর ছোটভাইয়ের সঙ্গে একস্কুলে, একক্লাসে পড়ে। চেরীর ছোটভাইয়ের সঙ্গে পড়ে

ব'লে চেরী তাকে কত ঠাট্টা করে, কিন্তু সে তাতে একেবারেই কান দেয় না। চেরীর ছোটভাই যখন স্কুলে পড়াশুনো করে, সে তখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দুরন্তপণায় ও বদমাইসীতে সে ক্লাসের সেরা ছেলে। মাষ্টাররা পর্য্যন্ত হার মেনেছেন তাকে শাস্তি দিয়ে-দিয়ে। সে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন স্কুল কামাই করে ও দুষ্টুমি ক'রে বেড়ায়। তার মা কত কাঁদেন, কত তাকে বোঝান কিন্তু সে একেবারে অবুঝ—সেসব গ্রাহ্যই করে না।

তবু বিধবা তাঁর একমাত্র সন্তানটি যাতে মানুষ হয়, সেই আশায় বুক বেঁধে গিন্নীমার তোসামোদ করতে করতে চাকরি ক'রে যান।

চেরীর বাবা গৌরীশঙ্করবাবু তরুণকে খুব কড়া শাসন করেন, তাই বিধবার বিশ্বাস, হয়তো একদিন ছেলে মানুষের মত মানুষ হতেও পারে! তাই মাইনে কম হ'লেও সেখানকার রাঁধুনীগিরি চাকরি ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও যান নি। প্রায় চারবছর হ'য়ে গেল, সেখানেই আছেন। কোনো অসুবিধা হলেও তা মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না শুধু ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে।

তরুণের সবচেয়ে বড় আড্ডা হ'লো, মোহনসিংয়ের কাছে।

মোহনসিংয়ের ঘাঁটি

চীনাপাড়ার মধ্যে মোহনসিং কারবার করে পরচুলা ও থিয়েটার যাত্রার পোষাকের—সেইখানেই অধিকাংশ সময় তরুণ থাকে। মোহনসিং তরুণকে বড় ভালবাসে। কেন ভালবাসে তা সে-ই জানে না। অথচ তার দুষ্টুমিমাখা মুখখানা একদিন না দেখতে পেলে তার চোখে যেন ঘুম আসে না। তাই পাছে সে তার কাছে না আসে এই ভয়ে মোহনসিং তরুণকে ঘুঁড়ি-লাটাই কিনে দেয়, লাট্টু-মার্ব্বেল কিনে দেয়; লজেঞ্চুষ-বিস্কুট চিনেবাদাম প্রভৃতি প্রায় রোজই খাওয়ায়।

মোহনসিং লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের। নামটা দেখে তাকে হিন্দুস্থানী বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে সে যে কোন জাত তা' কেউ সঠিক জানে না। সে সব ভাষাতেই কথা কইতে পারে। কখনো উর্দ্দু, কখনো হিন্দী, কখনো বিশুদ্ধ বাংলা, কখনো ইংরিজী, কখনো ভাঙা-ভাঙা চীনা। লোকটিকে দেখতে অতি সাধারণ ছিপছিপে রোগা ও কালো—জনস্রোতের মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কঠিন, কিন্তু তবুও ওই পাড়ার সবাই তাকে ভয় করে। তার দেহে নাকি অসাধারণ শক্তি এবং গুণ্ডাদের সে নাকি দলপতি! দিনের বেলা শান্তশিষ্ট হ'য়ে ব্যবসা চালায়, আর রাত্রে করে চুরি-ডাকাতি। চীনাপাড়ার গুণ্ডারা সবাই তার বশীভূত। সে বলে, তার স্ত্রী নেই;

পুত্র নেই, অথচ সে যে কেন একটা বিরাট বাড়ী ভাড়া ক'রে বাস করে তাও সকলের কাছে দুর্জ্ঞেয়।

সেই বড় বাড়ীটার নীচে যতগুলো ঘর, তার প্রত্যেকটিতেই একটা-না-একটা ব্যবসা চলে। কোনটায় মুসলমানের হোটেল, কোনটায় চীনেদের হোটেল, কোনটায় পানের দোকান, কোনটায় দর্জ্জির দোকান, কোনটায় চুলকাটার সেলুন, কোনটায় জুতো তৈরি হয় আবার কোনটায় গরুর মাংসের দোকান! এইসব ভাড়াটেদের কাছ থেকে মোহনসিং মাসে মাসে ভাড়া আদায় করে। এদের সকলকে সে-ই ঘরভাড়া দিয়েছে, সে-ই এদের মালিক। অথচ এই বাড়ীটার আসল মালিক একজন মুসলমান—তার নাকি দিল্লীতে ফলের দোকান আছে। মোহনসিং তার কাছ থেকেই গোটা বাড়ীটা অল্প মূল্যে ভাড়া নিয়েছে। আর বেশী ভাড়ায় দোকান-ঘর ভাড়া দিয়ে সে যা পায় তাতে সমস্ত বাড়ীটার খরচা উঠেও তার অনেক লাভ থাকে, তাই ওপরের ঘরগুলো সে নিজেই রেখেছে—অনেকের আবার এইরকম ধারণা!

যাক্, মোহনসিং লাভ করে কি লোকসান করে, গোটা বাড়ীটা নিয়ে একলা লোক সে কি করে না-করে, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তবে নানা লোক তার সম্বন্ধে নানা কথা বলে।

তা' বলুক, তাতে তরুণের কিছু এসে যায় না। তরুণকে মোহনসিং যে খুব ভালবাসে তা' সে জানে। তাই রোজই একবার ক'রে তার কাছে না এসে সেও পারেনা।

মোহনসিংয়ের গল্প তরুণ শুধু চেরীর কাছে করতো। এমন কি, সে এক-একদিন কিছু কিছু বিস্কুট ও চিনেবাদাম নিয়ে গিয়ে তাকে খেতে দিতো আর বলতো, লোকটা ভারী ভালমানুষ, জানিস চেরী, তোকে একদিন তার কাছে নিয়ে যাবো—দেখবি কত ভাল ভাল জিনিস তোকে খেতে দেবে—তুই যা চাইবি তাই দেবে।

চেরীর যে এইকথা শুনে লোভ না হ'তো তা নয়, কিন্তু বাড়ী থেকে এক পা তার বাইরে বেরোবার হুকুম ছিল না। বিশেষ ক'রে পেছন-দিকের ওই চীনেপাড়ার গলিতে।

একদিন সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তরুণের সঙ্গে একবারটি সেখানে যাবে কিনা। ওরে বাস্, কি মার সে খেয়েছিল মায়ের কাছে শুধু সেই কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে! আর তরুণেরও সেদিন কম শাস্তি হয়নি। সেই থেকে তরুণও আর তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে না, আর চেরীও যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তার বদলে তরুণ নিজেইএক-একদিন এক-একটা জিনিস তারপ্যান্টের পকেটে ক'রে লুকিয়ে এনে চেরীকে খেতে দিতো!

মোহনসিংয়ের ফাঁদ

মোহনসিংয়ের সম্বন্ধে চেরীর মা বা তাঁদের বাড়ীর কারুর কোনো বিশেষ ধারণা ছিল না ; তবে এটুকু সবাই জানতো যে, ওই পাড়াটার লোকগুলোই বদ। কাজেই দুর্জ্জনের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। মোহনসিং কে এবং কি বৃত্তান্ত - যেমন তরুণও জানতো না, তেমনি আর কেউই জানতো না।

তবে একদিন অকস্মাৎ একটা ঘটনা থেকে সবাইয়ের সঙ্গে সেই নামটার যেই পরিচয় ঘটে গেল সেই হ'লো তরুণের বিপদ। তখন থেকে তরুণের ওপর কড়া হুকুম হ'লো, সে যেন মোহনসিংয়ের কাছে কোনোদিন আর না যায়। তারপর থেকে তার নাম মুখে উচ্চারণ করলে তরুণকে শাস্তি ভোগ করতে হ'তো।

তাই মোহনসিংয়ের কাছ থেকে সেই পরচুল সে এনেছে শুনে চেরীর মা তাকে শাসিয়ে দিলেন যে, রাত্রে চেরীর বাবা বাড়ী ফিরলে তার ভীষণ শাস্তি হবে!

তরুণ প্রথমে ভেবেছিল, মোহনসিংয়ের নামটা সে মুখে আনবে না, কিন্তু হঠাৎ তা' যেন বেরিয়ে গেল! তা'ছাড়া মোহনসিংয়ের কাছে গেলে কি যে দোষ তা, সে ভেবেই পায় না! মোহনসিং তার সঙ্গে ত' কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি! আর তাদের বাড়ীর লোকেদের সঙ্গেই বা কি অন্যায় আচরণ করেছে সে! বরং

গৌরীশঙ্করবাবুর যখন হাজার টাকা পকেট মারা গিয়েছিল ধর্ম্মতলার মোড়ে, তখন তার চারদিন বাদে মোহনসিংয়ের তোসামোদ ক'রে তিনি সেই টাকাটা সম্পূর্ণ, এমন কি তাঁর নিজস্ব ম্যানিব্যাগটি পর্য্যন্ত ফিরে পেয়েছিলেন। আর তার জন্যে গৌরীশঙ্করবাবু তাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাইলে মোহনসিং হাসিমুখে তা' ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, বাবু, এই টাকাটা রাস্তার গরীব দুঃখীদের একদিন খাইয়ে দেবেন! তবে মোহনসিং লোকটা খারাপ কোথায় তরুণ ত' ভেবেই পায় না!

অথচ তাঁর বেশ মনে আছে, সেই ঘটনার দিন থেকেই গৌরীশঙ্করবাবু বাড়ী এসে তাকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন, খবরদার আর কোনোদিন মোহনসিংয়ের কাছে যাবিনি, লোকটা ডাকাতের সর্দ্দার—কলকাতার যত গুণ্ডা, সব তার হাতে। তা' নাহ'লে ব্যাগসুদ্ধ অতগুলো টাকা কি আবার ফিরে পাওয়া যায়!

আগে তরুণ মোহনসিংয়ের নাম সকলের কাছেই করতো, কিন্তু তারপর থেকে এক চেরী ছাড়া সে আর কারুর কাছে তার নাম করতো না। এবং আর কেউ জানতো না যে সে মোহনসিংয়ের কাছে রোজই যায়!

তবে যেদিন চেরীর সঙ্গে তরুণের
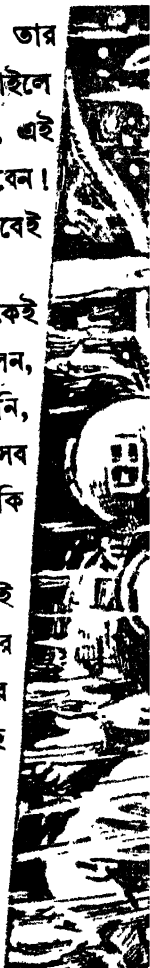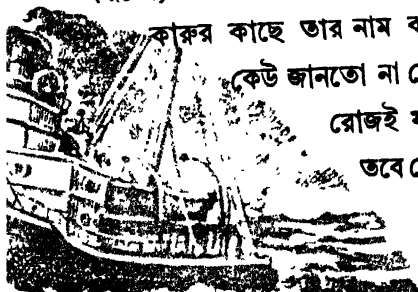
ঝগড়া হ'তো, সেইদিনই হ'তো বিপদ। চেরী তার বাবাকে ব'লে দিতো যে, সে মোহনসিংয়ের কাছে গিয়েছিল!

আর যায় কোথায়?

গৌরীশঙ্করবাবু তখুনি চীৎকার ক'রে হাঁক দিতেন তরুণকে। তরুণ জগতে একমাত্র ভয় করে এই লোকটিকে। তাই ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে কম্পিতকলেবরে তাঁর সামনে এসে যেই দাঁড়াতো, অমনি তিনি তার কান দুটো বেশ ক'রে পাকিয়ে দিয়ে বলতেন, রাস্কেল, আবার তুই মোহনসিংয়ের কাছে গিয়েছিলি? কেন গিয়েছিলি, বল? জানিস্, ওরা এইরকম ক'রে ছোট ছেলেদের হাত ক'রে, তাদের দিয়ে বাড়ীর সব সন্ধান জেনে নেয়? তোকে না: কতদিন বারণ করেছি—আর যা[illegible]

ভয়ে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে সে জবাব দিত—না।

প্রত্যেকবারেই এইরকম হয়। কিন্তু আজকে যা কাণ্ড সে বাধালে, তাতে ওপর নীচে, এমনকি বাড়ীসুদ্ধ লোক ত' গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে তার নামে নালিশ জানাবেই, তারওপর আবার মোহনসিংয়ের কাছে গিয়েছিল শুনলে তিনি যে কি পরিমাণ শাস্তি তাকে দেবেন সেই কথা চিন্তা ক'রে সে সমস্ত অপরাহ্নটা ভয়ে কাঁটা হ'য়ে রইলো।

তারপর সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসে ততই তার মন খারাপ

হ'য়ে যায়। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে চেরীর বাবা প্রত্যহ বাড়ী আসেন।

প্রতিদিন সে তাই রাস্তায় খেলতে বেরোয় এবং সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফেরে। কিন্তু সেদিন তার মনে এমন ভয় হ'লো যে, সে আর বাড়ীতে না ফিরে একেবারে পালালো কলকাতা ছেড়ে। যাতে আর কেউ, বিশেষ ক'রে গৌরীশঙ্করবাবু যেন তার সন্ধান না পান! এইজন্যে একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে এসে বিনা টিকিটে সে সামনে যে গাড়ীটা দেখতে পেলে তাতেই চেপে বসলো।

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সে যখন বাড়ী ফিরলো না, তখন তার মা ব্যস্ত হ'য়ে ছেলের খোঁজ করতে লাগলেন। বাড়ীর মধ্যে, ওপরে, নীচে, চারিদিকে খোঁজাখুঁজি ক'রে হতাশ হ'য়ে শেষে তিনি দ্বারোয়ানকে পাঠালেন, মোহনসিংয়ের দোকানে খোঁজ করতে। তিনি ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ মার খাবার ভয়ে সে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছে, কিন্তু দ্বারোয়ান এসে যা খবর দিলে তাতে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। মোহনসিংয়ের বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করেছে, সে নাকি আজ দিন-দুপুরে কোথায় একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি করেছে
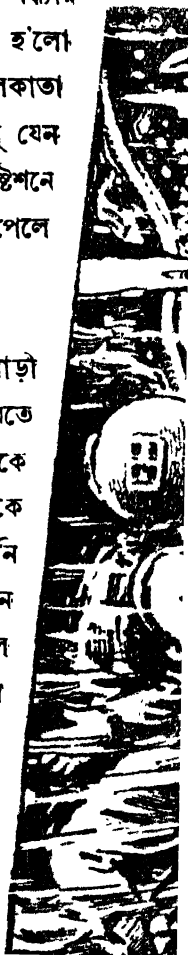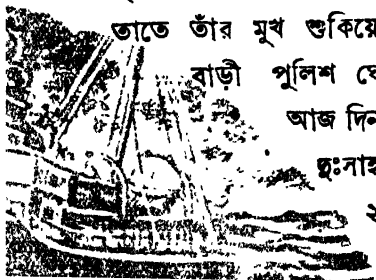
এবং বাড়ী থেকে উধাও হয়েছে। তাকেও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি সেই লোকটা তাঁর ছেলেকেও তার সঙ্গে নিয়ে পালালো? একবার তাঁর মনে এইরকম একটা সন্দেহ উঁকি মারলে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তাঁর মনে হ'লো যে, সে চোর, জুয়াচোর, ডাকাত, লম্পট, তার সঙ্গে আমার ছেলে যেতে পারে না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে খবরের কাগজ প'ড়ে শহরের লো[illegible] অবাক হ'য়ে গেল। একই সঙ্গে চারটি দুঃসাহসিক ডাকাতির খবর বেরিয়েছে এবং প্রত্যেকটিই তার আগের দিন দ্বিপ্রহরে হয়েছে। হয়েছে এক জায়গায় নয়, ভারতবর্ষের চারটি বড় বড় শহরে। একটি কলকাতায়, একটি বোম্বায়ে, একটি মাদ্রাজে এবং অপরটি দিল্লীতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সব জায়গাতেই একই রকমের জিনিস চুরি হয়েছে···কেবল মূল্যবান হীরা মুক্তা! কলকাতায় হয়েছে পাঁচলক্ষ টাকার, বোম্বায়ে সাতলক্ষ, মাদ্রাজে সাড়ে-চার লক্ষ এবং দিল্লীতে সওয়া-তিন লক্ষ।

এইসঙ্গে এই খবরটুকুও ছিল যে, চোর এখনো ধরা পড়েনি, তবে গোয়েন্দা-বিভাগ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

খবরের কাগজ টিপন্নী কেটেছে যে, এরা যে-একটি বিরাট দল তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং সবাই যে অতি সুশিক্ষিত ডাকাত তা' তাদের কার্য্যবিধি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পরিশেষে কাগজ পুলিশ-বিভাগকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি। তারা বলেছে যে, দিন-দুপুরে ভারতবর্ষের এত বড় বড় চারটে শহর থেকে চুরি হ'য়ে গেল অথচ চোর ধরা পড়লো না—এই-বা কিরকম আশ্চর্য্য কাণ্ড!

এইরকমের অদ্ভুত চুরির খবরে কলকাতা শহরে রীতিমত একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলে। সকলেরই মুখে শুধু ওই এক কথা! পরের দিনের খবরের জন্যে সবাই আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো—কি হয়, কি হয়! ধরা পড়বে কিংবা পড়বে না—এই নিয়ে লোকেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা এমন কি বাজি রাখারাখি পর্য্যন্ত চলতে লাগলো।

কিন্তু পরদিন সকালে আবার এইসম্বন্ধে যে সংবাদ বেরুলো তা' আরো কৌতূহলোদ্দীপক! বিখ্যাত এক সংবাদ-প্রতিষ্ঠান খবর দিয়েছে যে, চার জায়গারই গোয়েন্দা-বিভাগ অতি সুকৌশলে কাজ ক'রে চোরকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

চার জায়গারই চোর হাতের মধ্যে এসেও পালিয়ে গেছে! গভীর রাত্রে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে, কিন্তু তারি মধ্যে থেকে বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধ'রে নাকি দস্যুদলপতিরা পলায়ন করে। গোয়েন্দা-বিভাগের কর্ম্মচারীরা বুঝতেই পারেনি যে, এইরকম অতিবৃদ্ধার সাজের মধ্যে এতবড় দস্যু আত্মগোপন করতে পারে।

রীতিমত রোমাঞ্চকর কাহিনী! চুরির চেয়েও এ পলায়ন আরো ভয়ানক! কারা এইসব দস্যু? লোকের মনে এই ব্যাপার একটা ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে। পুলিশের চোখে এইভাবে ধুলো দিতে পারে—সাধারণ লোক ত' ভাবতেই পারে না। এর পরের খবরের জন্যে আবার সবাই উৎসুক হ'য়ে থাকে! ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মদ্দ—কারুর আর এ-খবর জানতে বাকি নেই। সকলের মুখেই কেবল সেই কথা!

পরের দিনের সংবাদপত্রে বেরুলো, এই চারজন দলপতির নাম পাওয়া গিয়েছে, তবে তারা এখনো ধরা পড়েনি—পুলিশ-বিভাগ মনে করছে, শীগ্গিরই তারা ধরা পড়বে। সেইসঙ্গে পুলিশ-বিভাগ জনসাধারণকে এক আবেদন জানিয়েছে যে, যদি কেউ নিম্নলিখিত নামের কোনো লোকের সন্ধান পান, অনুগ্রহ

ক'রে যেন নিকটতম পুলিশ-অফিসে জানাতে বিলম্ব না করেন।

কলকাতার দলপতির নাম—মোহনসিং

মাদ্রাজের দলপতির নাম—শেখরনমুদ্রিম্

দিল্লীর দলপতির নাম—ইসমাইল বক্স

বোম্বায়ের দলপতির নাম—এলবার্ট রোজ

মোহনসিংয়ের নাম শুনে কলকাতার লোকেরা অবাক হ'য়ে গেল। যারা তাকে চিনতো তারা বলাবলি করতে লাগলো, ঐরকম একটা ছিপ্‌ছিপে লোক কি ক'রে এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারে।

গৌরীশঙ্করবাবুও অবাক। তরুণকে সে-ই হয়তো কোথাও সরিয়ে দিয়েছে কিংবা মেরে ফেলেছে—এই তাঁর মনের একান্ত বিশ্বাস!

তিনি তরুণের মাকে অনেক বোঝালেন। বললেন, যদি তোমার ছেলে বেঁচে থাকে ত' ঠিকই আবার ফিরে আসবে—ওর মত দুরন্ত ছেলেকে বেশীদিন কেউ আটকে রাখতে পারবে না, তাও আমি ব'লে দিচ্ছি।

তরুণের মা প্রথম-প্রথম দিনকতক খুবকান্নাকাটি ক'রে শেষে মনিবের মুখের ওই কথায় বিশ্বাস ক'রে বুক বাঁধলেন।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

এদিকে ভারতবর্ষের সমস্ত গোয়েন্দা-বিভাগ চঞ্চল হ'য়ে উঠল এই দুঃসাহসিক চোরদের ধরবার জন্যে। দিকে-দিকে সতর্ক পাহারায় তারা ভারতবর্ষকে জালের মত ঘিরে ফেললে। সারা ভারতবর্ষ থেকে তারা তিনশো জন লোককে সন্দেহক্রমে ধ'রে জেলে পুরলে এবং তাদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করলে—এরা নাকি সব সেই বিরাট ডাকাতদলের এক-একটি অনুচর!

এমনিভাবে একদিন, দু'দিন ক'রে দশদিন কেটে যাবার পর হঠাৎ একটি বিদেশী খবর বেরুলো কাগজে। তাই প'ড়ে আবার ভারতবর্ষের গোয়েন্দা-বিভাগ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

খবরটি সংক্ষেপে কেবলমাত্র 'ইংরাজী' কাগজে বেরিয়েছে যে, প্যারীর বিশ্ববিখ্যাত একজিবিশন থেকে কাল রাত্রে মোট ষাট লক্ষ টাকার হীরা মুক্তা চুরি হ'য়ে গেছে। এবং এই সংবাদে আরো প্রকাশ যে, একই সময়ে চারটি বিভিন্ন 'ষ্টল' থেকে উক্ত মূল্যের জড়োয়ার গহনা উধাও হয়। চোর এখনো ধরা পড়েনি, তবে পুলিশ-বিভাগ এ-নিয়ে কঠিন তদন্ত শুরু করেছে।

এই সংবাদ প'ড়ে তখন ভারতবর্ষের সমস্ত পুলিশ-বিভাগই আবার সচকিত হ'য়ে উঠল। চারজন ডাকাত ভারতবর্ষের চারটে শহর থেকে একসঙ্গে চুরি করলে, আবার চারজন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীর অমন

সুরক্ষিত এক্‌জিবিশনের মধ্যে থেকে একই সঙ্গে চুরি করলে। এদের সঙ্গে কি তবে তাদের কোনো যোগাযোগ আছে ?

আশ্চর্য্য ব্যাপার, এরই ঠিক দু'দিন পরে আবার জার্ম্মেনীতে এক অদ্ভুত চুরির সংবাদ বেরুলো। সেখানেও চারটি জুয়েলারের দোকান থেকে একই দিনে, একই সময়ে চুরি হয়েছে, প্রায় বিশ লক্ষ টাকার হীরা-জহরৎ !

এইবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ কমিশনারদের টনক নড়লো। তাঁরা গোপনে গোয়েন্দা-বিভাগের কর্ত্তাদের একজায়গায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের এখানে যে চুরি হয়েছে তার আসামীরা এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে, এসম্বন্ধে আপনারা সুনিশ্চিত, কেমন ?

সবাই বললেন, নিশ্চয় ! কোথাও দিয়ে পালাবার উপায় নেই আমরা এমনভাবে বেড়াজালে তাদের ঘিরে রেখেছি।

কেউ-কেউ আবার বললেন, দু'চার দিনের মধ্যেই তারা অর্থাৎ দলপতিরা ধরা পড়বে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের কাছে খবর এসেছে, তাদের গোপন-আড্ডাগুলো নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে। লোকজন দিন-রাত পাহারায় ব'সে আছে···সেখানে এলেই আর রক্ষে নেই ! বেড়াল যেমন ক'রে ইঁদুরের ঘাড়ে

লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে তারাও এদের আক্রমণ করবে ব'লে 'ওৎ' পেতে ব'সে আছে।

আবার দু'দিন পরে এক রোমাঞ্চকর সংবাদ বিলেতি-কাগজে বেরুলো। লণ্ডনে নাকি একই দিনে চারটি জুয়েলারী দোকান থেকে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার হীরা চুরি গেছে। চোর এখনো ধরা পড়েনি, তবে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। এদিকে পরদিনই ভারতবর্ষের সব কাগজে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল যে, সেই বিখ্যাত চারজন দস্যুদলপতি একসঙ্গে ধরা পড়েছে।

আবার কলকাতা শহর গরম হ'য়ে উঠল। আবার সকলের মুখেই সেই এক কথা। রাস্তার মুটে-মজুর থেকে অফিসের বড়বাবু, বড় সাহেব—এমন কি, বেয়ারারা পর্য্যন্ত সব এই নিয়ে রীতিমত আলোচনা শুরু ক'রে দিলে।

গৌরীশঙ্করবাবু কাগজে ওই সংবাদটি পড়েই পরিবারের নাম ধ'রে চেঁচাতে-চেঁচাতে একেবারে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেন—ওগো, শুনছো, মোহনসিং ও তার দল ধরা পড়েছে!

তারপর আপনমনেই মুখে একটা কুৎসিত শব্দ উচ্চারণ ক'রে বললেন, বাবা, এ বৃটিশ রাজত্ব, এখানে ওদের

চোখে ধূলো দিতে পারে এমন সম্বন্দী কেউ আজপর্য্যন্ত জন্মায়নি। কৈ, আজও পর্য্যন্ত ত' শুনলুম না কেউ ভেগেছে এখান থেকে চুরি-ডাকাতী ক'রে। ওঃ, শিখেছিল বটে রাজ্যশাসন—আর ওই যে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের টিক্‌টিকি-বাহিনীটি আছে—হ্যাঁ বাবা, নমস্কার তোমাদের চরণে—পারবে তোমরা···

—কি পারবে তোমরা গো—বলতে বলতে চেরীর মা, চেরী ও তরুণের মা একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এই বলছিলুম কি, চোখে ধূলো দেবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের—এমন বাপের বেটা আজপর্য্যন্ত কেউ জন্মায়নি। বারো বছর পালিয়ে-পালিয়ে ঘুরছে, কিন্তু তারপরও ঠিক ধরা পড়েছে কত লোক। তবে এতদিন আর যেতে হ'লো না, বাছাধনরা কাল ধরা প'ড়ে গেছে—মোহনসিং আর তার তিনজন বন্ধু!

তরুণের মা তৎক্ষণাৎ ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তাহ'লে আমার তরুণের কি হবে?

কি আর হবে, এইবার সেও ফিরে আসবে নিশ্চয়। এই ব'লে জিবে একটু সরস শব্দ উচ্চারণ ক'রে বললেন, এইবার কি হয়! চুরি-বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা, আর ধরা পড়লেই মড়া! এইবার বাপধনরা, ঝোলো ফাঁসি কাঠে!

চেরী ও চেরীর মা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাগা, ফাঁসি কবে হবে?
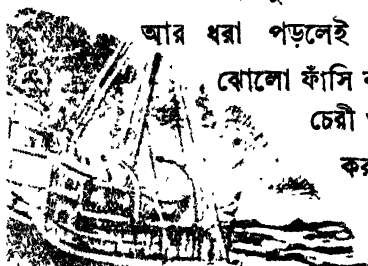
—হবে শীগ্‌গিরই। এখন বিচার ত' শুরু হোক, আর বাবাজীরা ঠাণ্ডাগারদে প'চে মরুক! হাতে যখন এসেছে তখন কি এককোপে একেবারে পাঁটাবলি দেবে—ও মুরগীর মত ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে দগ্ধে-দগ্ধে আগে শেষ ক'রে আনবে, তারপর লটকাবে ফাঁসিতে! হ্যাঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ ছাখোনি! এ বৃটিশ-রাজত্ব, এখানে চালাকি won't do!

পরদিন থেকেই বোম্বায়ের আদালতে আসামীদের বিচার শুরু হ'লো। সেখানকার কোর্ট লোকে লোকারণ্য···বহু দূর দূরান্ত থেকে দলে-দলে লোক এলো এই অসীম সাহসী ডাকাত-সর্দ্দারদের দেখতে।

একদিন, দু'দিন করতে-করতে ক্রমান্বয়ে আটদিন ধ'রে স্বতন্ত্রভাবে তাদের বিচার চললো এবং তারাই যে প্রকৃত আসামী সে-সম্বন্ধে কারো মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। কত সাক্ষী, কত জুরী বসলো—সবাই হ'লো একমত। তখন তাদের ফাঁসীর হুকুম হ'লো। আর সেই ভয়ঙ্কর দিনটি ধার্য্য হ'লো তার এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ তখন থেকে ঠিক সপ্তম দিনে।

কাগজে-কাগজে কত জয়ধ্বনি উঠল। দেশবাসীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সেই সংবাদ শুনে।

কিন্তু এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে খবরের কাগজের একটি কোণে আর-একটি উত্তেজনাপূর্ণ শুভ সংবাদ দেখা দিলে। আমেরিকার কোনো এক ধনী মহাজন তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গত সপ্তাহে এককোটি টাকার হীরা মুক্তা উপঢৌকন দিয়েছেন। আর এই হীরা মুক্তাগুলি নাকি ভারতীয় জহুরীর কাছ থেকে কেনা। সব-চেয়ে আনন্দের সংবাদ এই যে, ভারতবর্ষের সেই অতি-বিখ্যাত জহুরী চারজন উক্ত বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে নববধূকে সজ্জিত করার ভার গ্রহণ করেন। বিবাহের পরদিনই তাঁরা বিমানযোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ কমিশনারদের টনক নড়লো। তাঁরা তখন ছুটলেন দিল্লীতে সকলে একত্রিত হ'য়ে পরামর্শ করবার জন্যে।

দিল্লীতে সবাই এক হ'য়ে এই মন্তব্য করলেন যে, যারা ধরা পড়েছে তারা এদেরি আর-একটি দল, নিশ্চয় ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়েছে ইউরোপে ডাকাতি করবার জন্যে। তখুনি ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও ইংলণ্ডের গোয়েন্দা-বিভাগে টেলিগ্রাম চ'লে গেল। আর আমেরিকার পুলিশ-বিভাগের বড় কর্ত্তাকে অনুরোধ ক'রে তাঁর কাছেও তখুনি খবর গেল যে, যে চারজন

'ভারতীয় জহুরীর কাছ থেকে ওখানকার ধনী মহাজন ব্যক্তিটি হীরা-জহরৎ কিনেছেন, তাঁর কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ক'রে জানতে—সেই চারজনের কি নাম, কেমন দেখতে, কোথায় বাড়ী এবং তাদের কোম্পানীর নাম ঠিকানাই বা কি? আর খুব ভাল হয়, যদি তাদের কোনো ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়।

পরদিনই লণ্ডন, ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে খবর এলো যে, তাঁরা একথা ভাবতেই লজ্জা বোধ করেন যে, চারজন নেটিভ বা কালা-আদ্‌মী সাত সমুদ্র, তেরো নদী পেরিয়ে তাঁদের দেশে গিয়ে এইরকম দুঃসাহসিক ডাকাতি করছে! তা'ছাড়া, ওইসময় বা তার দু'একদিন আগেও ভারতবর্ষ থেকে যে-কোনো লোক সেইসব দেশে গিয়ে পৌঁচেছে এমন রিপোর্টও তারা কেউ তখনো পর্য্যন্ত পাননি।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যখন এ-সংবাদ এসে পৌঁছলো তখন তাঁরা মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করলেন। তাঁদের মনে হ'তে লাগলো, সত্যিই ত'...ওইসব সুদূর অঞ্চলে গিয়ে ওইরকম কড়া পাহারার মধ্যে থেকে চুরি করা কি সহজ কাজ! তা' কখনই সম্ভব নয়। মিছিমিছি তাঁরা কাল থেকে ভেবে মরছিলেন যে, হয়তো এর মধ্যে ভারতবর্ষের এই দলটির কোনো কারসাজি থাকতে পারে।

কিন্তু এখন তাঁদের মনে সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা হ'তে লাগলো।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

এদিকে ফাঁসীর দিন এসে গেল। যেদিন তাদের ফাঁসি হবে তার আগের দিন চারজনের চারখানা ছবি প্রকাশিত হ'লো সব বড় বড় কাগজে এবং তার নীচে আসামীদের যার যা নাম—বেরুলো।

ফাঁসি হবে ভোর-বেলা! তার আগের দিন রাত্রে যখন বেতার-যোগে বাংলা ভাষায় সেই সংবাদটি আরো ভাল ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে জানানো হচ্ছিল তখন দারুণ আগ্রহের সঙ্গে সকলে তাই শুনছিল। লোকের বাড়ীতে, থিয়েটারে ও সিনেমার সামনে, পার্কে, রাস্তার মোড়ের দোকানে-দোকানে ভীড়ে ভীড়। সবাই সেই সংবাদটি যেন নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে গিলছে! সরকারীভাবে যখন শেষবারের মত সেই সংবাদ ঘোষণা করা হ'লো তখন সহসা আর-একটি অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন কোথা থেকে ব'লে উঠল—সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘোষণা। যে চারজনের ফাঁসি দেওয়া হবে তারা আসল আসামী নয়। কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে জোর ক'রে সাজা দেওয়া হ'চ্ছে। যে-নাম তাদের ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ওনাম মোটেই নয়। ওই-নামের যারা রয়েছে, তাদের যারা ধরবে তারা এখনো জন্মায়নি! হুঁসিয়ার! নিরীহদের যারা ফাঁসি দেবে তাদের ভাল হবে না—ব'লে রাখছি।

কার কণ্ঠস্বর? কে বললে?

এই নিয়ে সেদিন বেতার-অফিসে হুলস্থুল প'ড়ে গেল চারিদিকে তখন খোঁজ খোঁজ রব উঠল। কিন্তু কোথাও কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ষ্টুডিয়োর যে 'ইন্-চার্জ্জ' ছিল তার তৎক্ষণাৎ চাকরি গেল। আর সেইদিন থেকে চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হ'লো।

রাত্রে সমস্ত প্রদেশের পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে আবার এক গোপন-সভা বসলো এবং বোম্বায়ের পুলিশ কমিশনার একখানি 'গ্রুপ ফটোগ্রাফ' বার ক'রে সকলের সামনে ধরলেন। এটি আমেরিকা থেকে 'এয়ারমেলে' সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে এসে পৌঁচেছে। এই ছবিটি সেই মার্কিনী-ধনীর কন্যার বিবাহসভায় তোলা হয়। দেশ-বিদেশের বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ছবি তার মধ্যে আছে। ছবিটির চার জায়গায় চারটি ছোট চিকে দেওয়া এবং তার নীচে এই চারজনের নাম লেখা—মোহনসিং, শেখরনমুদ্রিম্, ইসমাইল বক্স আর এলবার্ট রোজ। এরাই সেই ভারতীয় জহুরী!

নামগুলি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলের মুখ নিমেষে যেন কালো হ'য়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত্ত আর কারুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না, সকলে শুধু নীরব দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর প্রথম কথা কইলেন, বোম্বায়ের পুলিশ কমিশনার। তিনি বললেন, তাহ'লে এখুনি কর্তৃপক্ষদের টেলিফোনে সব জানানো যাক্, এ-অবস্থায় এদের ফাঁসি দেওয়া হবে, কি স্থগিত রাখা হবে। কি বলেন আপনারা?

সকলেই একবাক্যে বললেন, নিশ্চয়ই, তাতে আর সন্দেহ কি!

অন্য সবাই ঘরে ব'সে রইলেন আর তিনি টেলিফোন করলেন, দিল্লীতে।

আধঘণ্টা পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, না, এ ফাঁসি এখন স্থগিত থাকবে না, কালই তাদের মৃত্যু হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এরপর শুরু হ'লো, উনিশশো উনচল্লিশ সালের যুদ্ধ! হিটলারই সর্ব্বপ্রথম এই সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করলে, আর দেখতে-দেখতে তা' সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হ'য়ে পড়লো। তবু এই যুদ্ধের মরণোল্লাসের মধ্যে সেই চারজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের সন্ধান চলতে লাগলো—কিন্তু বৃথা।

এদিকে তিনবৎসর কেটে যাবার পরও তাদের কোনো 'পাত্তা' পাওয়া গেল না।

অথচ মধ্যে মধ্যে তাদের

ডাকাতির খবর আসতে লাগলো। কখনো একদিনে ভারতবর্ষের চারটে ব্যাঙ্ক লুঠ হয়, কখনো একই দিনে চারটে জায়গায় দুঃসাহসিক ট্রেণ-ডাকাতি হয়—কখনো বা একই দিনে চারটি শহরে একসঙ্গে লুঠ-পাট হয়। এমনিভাবে যখন যা হয়—একদিনে চার জায়গায় পৃথকভাবে হয়। এই থেকেই পুলিশের ধারণা হ'লো যে, এরা—তারাই! এবং এখন তারা ভারতবর্ষেই আছে।

তখন কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতের 'স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড' থেকে কয়েকজন সুদক্ষ গোয়েন্দা ভারতবর্ষে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। দশজন এলেন। তাঁরা ভারতবর্ষের মানচিত্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, কিছুদিন পরেই খবর পাওয়া গেল, ভারতবর্ষের চারটি শহরে চারজন 'স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের' মৃত্যু হয়েছে। আর চারজন দেহের ঠিক একই স্থানে আঘাত পেয়েছেন। তাঁদের সকলেরই কপালের ওপর গুলির দাগ! এই থেকে দেশের লোকেদের মনে আবার কৌতূহলের সৃষ্টি হ'লো! আবার সকলের মুখে সেই ডাকাতদের নানারকম কাহিনী ঘুরতে লাগলো।

পুলিশ কমিশনাররা আবার গোপনে সভা আহ্বান ক'রে দলে-দলে নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করবার

পরিকল্পনা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ গোয়েন্দায় ছেয়ে ফেলবেন। কয়েকটা নেটিভ-ডাকাতের এতবড় বুকের পাটা!

তৎক্ষণাৎ সেইমত কাজ শুরু হ'লো। দলে-দলে গোয়েন্দা ছুটলো—গ্রামে, শহরে, পাহাড়ে, নদীতে, বন-জঙ্গলে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র!

দেখতে দেখতে একমাস, দু'মাস ক'রে প্রায় ছ'মাস কেটে গেল! অথচ এই ছ'মাসে ছ'বার চারজন চারজন ক'রে গোয়েন্দা-হত্যার সংবাদ বেরুলো।

এ কাদের কাজ তা' আর পুলিশের বুঝতে বাকি রইলো না।

তখন মিলিটারী সৈন্য লাগাবার প্রস্তাব হ'লো এবং সেইমত অষ্ট্রেলিয়া থেকে কয়েক জাহাজ সৈন্য আমদানী করা হ'লো। কিন্তু আশ্চর্য্য, ভারতমহাসাগরের বুকে তাদের চারখানি জাহাজ হঠাৎ ডুবি হ'লো।

এটা জাপানীদের কাজ কি সেই দস্যুদের কাজ—তাই নিয়ে তখন পুলিশ-বিভাগ মাথা ঘামাতে লাগলেন।

এরপরে আবার চারখানা এরোপ্লেন ধ্বংসের খবর পাওয়া গেল। আমেরিকা থেকে চারজন ডিটেকটিভ ভারতবর্ষে আসছিলেন, কিন্তু পথে শত্রুদের কয়েকটি

বোমারু-বিমানের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়, ফলে তাদের চারখানি উড়োজাহাজই বিনষ্ট হয়।

এ আবার এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হ'লো। জাপানীরা আক্রমণ করছে অথচ চারটে ক'রে বিনষ্ট করছে কেন! এই নিয়ে পুলিশ-কর্ম্মচারীরা তখন মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন! তবে কি এই দস্যুরা ছদ্মবেশে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে! কিংবা এদের একটা বিরাট বাহিনী আছে, পৃথিবীর সারা দেশময় যারা কাজ করছে!

এইবার তরুণের কথা কিছু বলা দরকার। এতদিন ত' তার কোনো খবরই ছিল না। এখানে, ওখানে, সেখানে ঘুরে-ঘুরে ছোট-খাটো নানারকমের চাকরি করতে করতে সে একদিন বোম্বাই শহরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেও প্রায় দু'বছর আগের কথা। তারপর সেখানে গিয়ে 'ডক্টর লোহিয়া' নামে এক বিখ্যাত ডুবুরীর অফিসে 'বয়ের' কাজ নেয়।

ডক্টর লোহিয়া কেবলমাত্র ডুবুরি নন, তিনি একজন বৈজ্ঞানিকও বটে। তিনি নিজে যে কোম্পানীর মালিক তার কাজ হ'চ্ছে—যেসব জাহাজ ডুবে যায় অতল সমুদ্রগর্ভে, 'তাদের ভেতর থেকে লুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধার করা!

তরুণ এখানে মাইনে বেশী

পেতো না—তবে তার মনে বড় আশা ছিল যে, সে একদিন তার মনিবের সঙ্গে সমুদ্রের তলায় যাবে ডুবুরীর পোষাক প'রে · যে সমুদ্র এত ভয়ঙ্কর, তার তলায় কি আছে দেখার জন্যে তার কিশোর মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। সে দু'একবার মনিবের কাছে আব্দারও করেছিল, কিন্তু তিনি প্রশ্রয় দেননি। বলেছিলেন যে, সে আরো বড় হ'লে তবে নিয়ে যাবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিনবছর পরে একদিন ডক্টর লোহিয়া এসে তরুণকে বললেন, তোমাকে কাল আমার সঙ্গে যেতে হবে। প্রশান্ত-মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা জাহাজ ডুবি হয়েছে, তাতে বহু লক্ষ টাকার সোনা রূপা ও হীরা-জহরৎ ছিল আমেরিকার এক কোম্পানীর। তারা আমাদের কোম্পানীকে কনট্রাক্ট দিয়েছেন যে, একমাসের মধ্যে সমুদ্রের তলা থেকে সেই সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে দিতে হবে। তাই কালই রওনা হওয়া চাই, তা' নাহ'লে এতটা পথ গিয়ে জলমগ্ন জাহাজটিকে খুঁজে বার করা একমাসের মধ্যে সম্ভব হবে না। তুমি প্রস্তুত আছো ত' যেতে?

তরুণের বক্ষ উৎসাহে স্ফীত হ'য়ে

উঠল। সে বললে, কাল কি, আমি আজই যেতে প্রস্তুত আছি— আমায় কি কি জিনিস নিতে হবে, স্যার ?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, কিছু নিতে হবে না—সমস্ত অফিস থেকে পাবে। তা'ছাড়া আর যা-যা দরকার সব আমি নেবো। তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা।

তরুণের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। সে এই সুযোগের অপেক্ষায় এতদিন হাঁ ক'রে বসেছিল। এতদিন পরে তার সে আশা মিটবে।

ডক্টর লোহিয়ার আরো দু'জন সহকারী ছিল, তারাই সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে যেতো যখন যেখানে প্রয়োজন। তাদের একজন ছুটি নিয়ে দেশে গেছে এবং একজনের শরীর খারাপ। তাই ডাক পড়েছে, তরুণের। তরুণ নবীন কিশোর! বয়েস সতেরো-আঠারো, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীর ছেলেদের মত ভীরু ও দুর্ব্বলচিত্ত নয়। দুর্গম পথে, দুঃসাহসিক-যাত্রায় তার আনন্দ। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে ভারতবর্ষের নানা অরণ্যে, কান্তারে সাগরে, পর্ব্বত-চূড়ায় ও মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। কত স্মৃতি, কত ভয়-ভাবনার ইতিহাস, সেইসব স্থানের সঙ্গে আজো জড়িয়ে আছে তার মনে। তবু আরো দেখবার জন্যে তার মন অস্থির হ'য়ে ওঠে। যা দেখেছে

তার জন্যে নয়। যা দেখেনি তারই জন্যে। সমুদ্রের তীরে ব'সে তার অনন্ত নীল ঢেউগুলি দেখতে দেখতে কতদিন তার মন ডুবে গেছে তার অতল গর্ভে! সেখানে কি আছে দেখবার জন্যে তার মনে কী বিপুল বাসনা জেগেছে! তাই সে চাকরি নিয়েছিল ডক্টর লোহিয়ার কাছে।

ডক্টর লোহিয়া একজন নামকরা ডুবুরি। বিলাত, আমেরিকা থেকে সমুদ্রতলের গবেষণাকারী হিসাবে বহু খ্যাতি লাভ ক'রে নিজের দেশে ফিরে, বোম্বাই শহরে একটি কোম্পানী খোলেন। এই কোম্পানীর কাজ হ'লো, যেসব জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায় তাদের উদ্ধার করা। এই ব্যবসায় ডক্টর লোহিয়ার প্রচুর অর্থাগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি ত' আছেই।

তরুণ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে এই অফিসে চাকরি নিয়েছিল বহু আশায়। তাই এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা শুনে তরুণের সর্ব্বাঙ্গ যেন আনন্দে কাঁপতে লাগলো। সমুদ্রগর্ভে নেমে যাবে সে। সেই অতল সমুদ্রে সে ডুবে যাবে! সত্যই কি তবে তার কল্পনা এতদিনে বাস্তবে পরিণত হ'লো? সে আর চিন্তা করতে পারে না।

পরদিন অপরাহ্নে তারা বোম্বাই-বন্দর থেকে সমুদ্রে
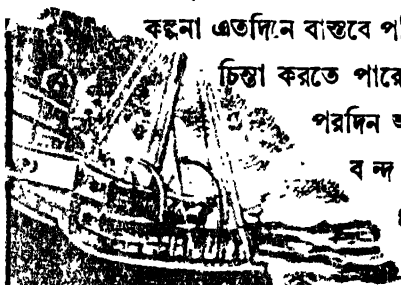
ড়ি দিলে। ডক্টর লোহিয়ার নিজের জাহাজ। তাতে সমস্ত
রঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। একখানি ম্যাপ খুলে ব'সে ছিলেন তিনি
ং তরুণকে দেখাচ্ছিলেন কোন পথ দিয়ে কোথায় যেতে হবে।
য়েকদিন পরে যথাস্থানে গিয়ে জাহাজ পৌঁছলো। এই
ায়গাটি সমুদ্রের এমন স্থলে যেখান থেকে অষ্ট্রেলিয়া, মালয়-
দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপান খুবই কাছে। ডক্টর লোহিয়া সেইখানে
জাহাজ বাঁধলেন। তারপর তরুণকে পরালেন, ডুবুরীর
পোষাক—মুখোস, নল, আরো কত কলকব্জা লাগানো তার
সঙ্গে—বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিকতম পোষাক! এর এক-
একটির দাম হাজার হাজার টাকা! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার,
দেখবার, এবং কথা বলবার কোনো অসুবিধাই এতে হয় না।
পোষাকটা একটু ভারী ব'লে তরুণের তখন খুব অসুবিধা
হচ্ছিলো।

ডক্টর লোহিয়া বললেন, জলে নামলেই ভার কমে যাবে
আর তখন সে স্বচ্ছন্দে নীচে নামতে পারবে!

ব্যাস, তারা দু'জনেই তখন সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে। তারপর
ধীরে ধীরে ক্রমশঃ তলার দিকে যেতে লাগলো।
তাদের উভয়ের পিছনে মোটা তারের মত
ধাতু নির্মিত নল লাগানো ছিল—
উপরে জাহাজে কপিকলের

সঙ্গে সেগুলি এমনভাবে লাগানো যে, ইচ্ছামত যতদূর খুশি তারা যেতে পারে। ওপরে আরো অনেক লোকজন কলকব্জা কানে দিয়ে বসেছিল—তাদের সঙ্গে সমুদ্রের তলা থেকে কথাবার্ত্তা সহজেই চলতে পারে।

ডক্টর লোহিয়া তরুণকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে থাকো···অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছো কেন?

তরুণের চোখের সামনে তখন একটা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা অজানা-জগৎ ফুটে উঠেছে—সে কি অদ্ভূত জগৎ, কি তার সৌন্দর্য্য, কি রহস্য ও বিরাটতা! যে কখনো দেখেনি তাকে বোঝানো যায় না। তাই সে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল এবং কত দ্রুত যে যাচ্ছিলো, সেদিকে তার খেয়াল ছিল না।

ডক্টর লোহিয়ার কথা শুনে যেন তার চমক ভাঙলো। সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আমি বুঝতে পারিনি, স্যার।

ডক্টর লোহিয়া তখন বললেন, সাবধান, যদিও আমি সঙ্গে আছি ব'লে কোনো ভয় নেই, তবুও মনে রেখো, এখানে তুমি একেবারে নতুন। এ তোমার ডাঙার ওপরের জগৎ নয়। এখানে কোথায় কি আছে যেমন তোমার জানা নেই, তেমনি কখন কোথায় গিয়ে পড়ো তারও ঠিক নেই। সমুদ্র যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্কর, মনে রেখো। তা'ছাড়া পৃথিবীর তিনভাগ জল,

একভাগ স্থল—এই একভাগে যেসব লক্ষ লক্ষ রকমের জীবজন্তু দেখে মানুষ বিস্মিত হয়, তার তিনগুণ কিন্তু এখানে আছে। তারওপর আবার সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য পাহাড়-পর্ব্বত আছে, গুহা-গহ্বর আছে। বে-কায়দায় যদি তোমার পোষাকের কোনো অংশ কিংবা বাতাসের নল এ-সবে আট্‌কে যায়, কি ধারালো পাথর লেগে কেটে যায়, তাহ'লে অনভিজ্ঞ লোক ত' দূরের কথা, ওস্তাদ-ডুবুরীরা পর্য্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না।

তরুণের সর্ব্বাঙ্গ একবার শিউরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অদ্ভুত-দর্শন মাছ তার চারিদিকে ছুটে এলো। তরুণ তাড়াতাড়ি ডক্টর লোহিয়ার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, এগুলো কি?

লোহিয়া বললেন, ভয় নেই, ওরা মাছ—ওদের রাজ্যে কোনো নতুন জীব. দেখলে ওদের কৌতূহলের সীমা থাকে না, তাই ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে পরখ ক'রে দেখতে চায় এরা কী ধরনের জীব।

তরুণ বললে, এদের সবগুলোই কি মাছ? কতকগুলোর চেহারা মাছের মত বটে, কিন্তু ঐ নানারকম রঙের আর ঐ যে কোনোটা গোল, কোনোটা চ্যাপ্‌টা-ঢঙের, কোনোটা সাপের মত

লিক্‌লিকে, কোনোটা বা থল্‌থলে একতাল মাংসপিণ্ডের মত—ওদের কি নাম ?

লোহিয়া বললেন, হ্যাঁ, ওরা সবাই মৎস্যশ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ওদের নাম সোনালী-মাছ, জেলি-মাছ, শটল্‌-মাছ, নক্ষত্র-মাছ প্রভৃতি। এ-ছাড়া আরো বহুরকমের ছোট বড় মাছ তোমার নজরে পড়বে যাদের সবগুলির নাম জানা সম্ভব নয়। কারণ, সমুদ্রের ওপর থেকে চল্লিশ ফুটের মধ্যে প্রাণী-জগতের বৈচিত্র্য বেশী—এখানে রৌদ্র-সম্পাতে যে অপূর্ব্ব বর্ণের সৃষ্টি হয়, গভীর জলে তা' দেখা যায় না।

এইসব দেখতে দেখতে আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তরুণ যেন এক স্বপ্নময় পরীর রাজ্যে গিয়ে হাজির হ'লো। রূপে, বর্ণে, কারুশিল্পে তা' অবর্ণনীয়। তরুণের মাথা ঘুরে গেল। চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে সে ভাবতে লাগলো, এই সমুদ্রগর্ভে এমন স্বর্গ কোথা থেকে এলো !

লোহিয়া তরুণের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কোথায় এসেছো বলো দেখি ?

তরুণ বিস্ময়াবিষ্টকণ্ঠে বললে, কি জানি, এত সুন্দর দৃশ্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

লোহিয়া বললেন, "তুমি প্রবাল-

রাজ্যে এসে পড়েছো। তরুণ

প্রবালের নাম শুনেছিল, কিন্তু তার সৌন্দর্য্য যে এমন অসাধারণ তা' সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের রঙের এত বৈচিত্র্য? লাল, নীল, সবুজ, হলদে, আরো যে কতরকমের মিশ্রিত রঙ তার ঠিক নেই। বাস্তবিক জলের তলায় ডুব দিয়ে যারা প্রবালের এই রাজ্য দেখেছে তারা জানে, পৃথিবীর আর কোনো দৃশ্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সে যেন চিত্রাঙ্কিত কোনো স্বপ্নপুরী! জলের ভিতর থেকে প্রবালের থাম উঠেছে। তার মাঝে-মাঝে প্রবালের গুহাপথ আর তার ভিতরে খেলা করছে, প্রজাপতির চেয়েও বিচিত্র সব মাছ—নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির। এছাড়া ঝিনুক, কাঁকড়া ও আরো কতরকম প্রাণী। প্রবাল হয় নানা ধরনের। কোনো-জাতের প্রবাল গাছের মত শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে উর্দ্ধ মুখে, কোনো-জাতের প্রবাল গোলাকৃতি, কোনোটা আবার মানুষের মাথার মত। আবার একজাতের প্রবাল আছে যাদের দেখলে মনে হয়, গাছের ডালে সারি-সারি ফল ধ'রে রয়েছে। এগুলিকে শুধু প্রবাল বলে না, প্রবালের উপনিবেশ বলা যেতে পারে। কারণ, পৃথকভাবে দেখতে গেলে, প্রবাল সামান্য একটি ফুলের কুঁড়ির মত ক্ষুদ্র প্রাণীমাত্র!' বহুর একত্র সমাবেশ হয় বলেই তাদের উপনিবেশগুলি অমন বিচিত্র দেখায়।

মোহনসিংয়ের ফাঁদ

ডক্টর লোহিয়াকে তরুণ তখন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা স্যার, এই প্রবাল জিনিসটা কি ?

লোহিয়া বললেন, প্রবাল হ'লো একরকমের অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক-প্রাণী। কিন্তু ফুলের কুঁড়ির মত অনেক সময় উদ্ভিদ-জাতীয় জীবের সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারে মিলে-মিশে ঘর করে। সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে এই প্রবাল-কীটরা সাধারণতঃ বাস করে। সেইজন্যে পঞ্চাশ-ষাট ফুটের নীচে আর এদের দেখা যায় না। এই যে প্রবালের বিরাট-বিরাট ব্যাপার দেখছো, এগুলোও, বৈজ্ঞানিকদের মতে, তৈরি হ'তে দশলক্ষ বছর লেগেছে। অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এইরকম প্রবাল-কীটের অস্থি জমা হ'তে হ'তে নাকি একদিন এই অত্যাশ্চর্য্য বস্তুটি জন্মায়।

তরুণ বললে, বৈজ্ঞানিকরা কি কোনো জিনিসকেই প্রকৃতির সুন্দর দান ব'লে মেনে নিতে পারেন না ? তাকে চিরে-চিরে—কে কোন জীব-জন্তুর অস্থি থেকে, কার মর্ম্ম থেকে, কেমন ভাবে, কি ক'রে হয়েছে তার একটা ফতোয়া না দিয়ে সুস্থির হন না ?

ঠিক সেইসময় ডক্টর লোহিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন, অক্টোপাশ! শীগগির এদিকে পালিয়ে এসো তরুণ! এই ব'লে, তার একটা হাত ধ'রে টানতে-টানতে সেখান থেকে একটু দূরে

স'রে গেলেন। তরুণের সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বইয়ে পড়েছিল যে, অক্টোপাশের মত ভয়ঙ্কর জন্তু আর নেই; সমুদ্রে এ-একটা জীবন্ত আতঙ্ক। হাঙর বা তিমির চেয়েও এরা আরো ভয়ঙ্কর, আরো বীভৎস—যেন মূর্ত্তিমান মৃত্যু! তারপর কম্পিতস্বরে লোহিয়াকে সে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে, কৈ অক্টোপাশ! এখান থেকে তো দেখা যাচ্ছে না?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, ওই দ্যাখো!

তরুণ বললে, কৈ, দেখতে পাচ্ছিনা তো? কিরকম দেখতে, খুব বড়ো?

—না না, ওই যে হাতির শুঁড়ের মত কতকগুলো একজায়গায় জড়াজড়ি ক'রে পড়ে রয়েছে, ওই হ'লো অক্টোপাশ। বাংলায় একে বলা যেতে পারে, 'অষ্টপদী' মানে যার আটটা পা আছে পা-ই বলো, হাতই বলো, আর শুঁড়ই বলো—ওই আটটা লম্বা-লম্বা জিনিস দিয়ে ওরা শিকারকে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, তার আর এক-পা নড়বার শক্তি থাকে না। তা'ছাড়া ওই প্রত্যেকটি শুঁড়ের সঙ্গে থাকে অসংখ্য Sucker বা শোষক-যন্ত্র। এই এক-একটি শোষকের সাহায্যে দশ সের ওজন পর্য্যন্ত টেনে তোলা যায়। শিকারের মাংস ছিঁড়ে মুখে তোলবার ব্যবস্থা অক্টোপাশ এইভাবে করে।

তরুণ বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, বলেন কি স্যার, এত শক্তি ওই সামান্য জন্তুটার?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, সামান্য? জানো, কোনো-কোনো অক্টোপাশের প্রত্যেকটা শুঁড়ে তিনশো পর্য্যন্ত Sucker পাওয়া গেছে? কাজেই, যার এক-একটা বাহুতে এইরকম অসংখ্য Sucker থাকে সে তো মহাযোদ্ধা হবেই! তাই এরা বড়-বড় জানোয়ারদের আক্রমণ করতে এতটুকু ভয় পায় না। তিমির গা থেকে প্রায়ই এরা মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়।

তরুণ বললে, এর শুঁড়গুলো তো এক-একটা দু'ফুটের বেশী লম্বা হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না? এরা কি সবাই এই-রকম দেখতে, না এটা অক্টোপাশের বাচ্ছা?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, বাচ্ছা নয়, ওরা সচরাচর ওই-রকমেরই দেখতে হয়—তবে এই প্রশান্তমহাসাগরে খুব বড়-বড়ও আছে, তাদের পরিধি প্রায় চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত হয়। জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে এরা অনেক সময় জেলেদের নৌকা উল্টে দেয় ব'লে শোনা গেছে।

তরুণ বললে, আচ্ছা স্যার, ওটা ওভাবে ওখানে প'ড়ে আছে কেন, শিকার ধরবার জন্যে নাকি?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, অক্টোপাশের স্বভাবই ওইরকম ওৎ পেতে ব'সে থাকা। সমুদ্র যেখানে

অগভীর, তার তলাকার মাটিতে কিংবা পাথরের আড়ালে চুপ ক'রে ওরা অপেক্ষা করে। আর যেই গলদা-চিংড়ী, কাঁকড়া কিংবা শামুক কি ঝিনুক এসে পড়ে, অমনি টপ্ ক'রে লম্বা শুঁড়টা বাড়িয়ে ধ'রে ফ্যালে। ঝিনুকের শাঁস খেতে অক্টোপাশ সব-চেয়ে ভালবাসে। তাই নানা রঙের ঝিনুক সমুদ্রের তলায় কোথাও প'ড়ে আছে দেখলেই সাবধান হ'তে হবে, বুঝতে হবে, নিকটে কোথাও অক্টোপাশের বাসা আছে।

কয়েক-পা এগিয়ে যেতেই আবার কতকগুলি অদ্ভুত জিনিস তরুণের চোখে পড়লো। সে প্রশ্ন করলে, ওগুলো কি? ওই যে যকৃতের মত অসংখ্য ছোট-ছোট ফুটোওলা নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির বস্তু এক-জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে? ওই দেখুন, আবার ওদের প্রত্যেকটার মুখে চুলের মত সরু-সরু এক-একটি শুঁড় অনবরত নড়ছে!

ডক্টর লোহিয়া বললেন, ওর নাম—স্পঞ্জ। জলের স্রোতের সঙ্গে যে-সমস্ত আনুবীক্ষণিক প্রাণী ও জৈব-পদার্থ ফুটোগুলির ভেতর প্রবেশ করে, স্পঞ্জ সেইগুলিকেই আত্মসাৎ ক'রে বাঁচে। স্পঞ্জ উদ্ভিজ্জ নয়, প্রাণীই। কিন্তু সম্পূর্ণ অদ্ভুত ধরনের। ওদের সমস্ত দেহময় মুখ, আবার সমস্ত দেহটাই উদর। সমুদ্রের

তলায় ওই নিরীহ-চেহারার জীবগুলি দৈত্যের মত এক অদ্ভুত ফাঁদ পেতে ব'সে আছে, একবার এই ফাঁদের কাছাকাছি এলে আর নিস্তার নেই। অসংখ্য মুখ হাঁ ক'রে তাকে গ্রাস করবে।

তরুণ বললে, বাজারে যে স্পঞ্জ বিক্রি হয়, সেগুলো কি এই জিনিস?

লোহিয়া বললেন, হ্যাঁ, সেগুলি এদেরই মৃতদেহ।

—এগুলো কি খুব বেশী জন্মায়?

—বেশী মানে? হাজারে-হাজারে—লাখে-লাখে! পুরাণে যে রক্তবীজের উল্লেখ আছে, এরা তাদের মত অমর। টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে এদের কেটে ফেললেও এরা মরে না। প্রত্যেকটি কুচি থেকে আবার এক-একটি স্পঞ্জ গ'ড়ে ওঠে। এরা প্রবালেরই জাত। সমুদ্রের তলায় এরকম আরো বহু অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রাণী আছে ব'লে শোনা যায়।

আর-একটু এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ তরুণ থমকে দাঁড়ালো।

লোহিয়া বললেন, দাঁড়ালে কেন?

—অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না—এতক্ষণ যে আলো ছিল তা' কোথায় গেল?

—সূর্য্যের আলো সমুদ্রের সর্ব্বত্র তো যায় না—এই পর্য্যন্তই

এর গতি। এখন থেকে অন্ধকার শুরু হ'লো। যত গভীরে যাবে তত অন্ধকার বেশী।

—তাহ'লে কি ক'রে আমরা যাবো, যদি কোনো ভয়ঙ্কর জন্তুর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ি?

—তার জন্যে আমি অবশ্য আলো নিয়ে এসেছি, কিন্তু তার এখন দরকার হবে না, প্রকৃতিই সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। আমাদের যেমন অন্ধকারে চলা-ফেরা করতে কষ্ট হয়—এখানকার প্রাণী-জগতেরও ঠিক তেমনি হয়, তাই আলোরও ব্যবস্থা করেছেন তিনি, যিনি এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে অপরূপ ক'রে সৃষ্টি করেছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তরুণের চোখের সামনে নক্ষত্রখচিত আকাশের মত এক দৃশ্য ফুটে উঠল। অসংখ্য ছোট-বড় প্রাণী—তাদের গা থেকে আলো বিকীর্ণ হ'চ্ছে। তরুণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। প্রকৃতির একি অদ্ভূত রহস্য!

একটু পরে হঠাৎ তরুণ চেঁচিয়ে উঠল—ওই দেখুন, চিংড়ী-মাছের গা থেকে আলো বেরুচ্ছে!

ডক্টর লোহিয়া বললেন, এইতো সবে শুরু—আরো যত এগিয়ে যাবে তত দেখবে, কতরকমের প্রাণীর দেহ থেকে আলো বেরুচ্ছে, এই আলো নানা রকমের ও নানা রঙের হয়। বাতির মত, দীর্ঘ আলোকদণ্ডের মত,

জাহাজের পোর্ট-লাইটের মত, রঙীন আতস-বাজীর মত—সবুজ, রাঙা, সাদা নানা রঙের আলো। কোনো-কোনো প্রাণীর ডানা দিয়ে আলো বেরোয়, কোনো প্রাণীর পিঠ দিয়ে আলো বেরোয়, কোনো প্রাণীর গাল দিয়ে, কারুর বা কপাল দিয়ে। যদিও দেখা গিয়েছে যে, স্কুইড (squid) ও চিংড়ী-জাতীয় প্রাণীরা স্বয়ম্প্রভ হয়, তবুও এইরকম হরেক-রকমের প্রাণী চোখে পড়ে। আবার একশ্রেণীর মাছ আছে, তাদের কপালে একটিমাত্র চোখ, একচক্ষু দৈত্যের মত। কিন্তু ওই একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি এমন প্রখর যে, একটা ছোট-খাটো দুরবীক্ষণের মত বহুদূর থেকে তারা নিজেদের শিকার চিনে নিতে পারে—এই আলোক ব্যবহারও হয় নানা রকমে। কোনো-কোনো আলো খাদ্যকে আকৃষ্ট ক'রে খাদকের মুখের কাছে নিয়ে আসে—তা' নাহ'লে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে শিকার খুঁজে বার করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আবার এইরকমের আলোর সাহায্যে অনেক সময় প্রাণীরা নিজ-নিজ জাতের অপরাপর প্রাণীকেও চিনে নেয়।

এইসব দেখে-শুনে তরুণ হতবাক হ'য়ে গেল। প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য্য সুব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে তার মন সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে অবনত হ'লো বার-বার।

কি সুন্দর আয়োজন! পৃথিবীর ওপর যেমন অন্ধকারের জন্যে আলোকের ব্যবস্থা করেছেন, এই অতল সমুদ্রের গর্ভেও তার ক্রুটী হয়নি। তাঁর সৃষ্ট সন্তানদের প্রতি কী অসীম মমতা! কোথাও এতটুকু অবিচার, এতটুকু অন্যায় নেই প্রকৃতির রাজ্যে! বাস্তবিক ডক্টর লোহিয়ার মুখ থেকে যতরকম আলোক-দানকারী প্রাণীর কথা তরুণ শুনলে, সবগুলিকেই সে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করলে—যত গভীর থেকে গভীরতর সমুদ্রে নামতে লাগলো। যেতে-যেতে হঠাৎ ডানদিকে একটা বিরাট কালো বস্তু দেখে তরুণ জিজ্ঞাসা করলে, ওটা কি স্যার?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, ওইটাই বোধ হ'চ্ছে যেন সেই জলমগ্ন জাহাজ যার সন্ধানে আমরা এসেছি। এতটা দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে আর-একটু কাছে গেলেই জিনিসটা স্পষ্ট হবে।

কাছে গিয়েই ডক্টর লোহিয়া টর্চ্চলাইটটা জ্বাললেন। কিন্তু জাহাজ কৈ? এটা তো একটা পাহাড়! সমুদ্রের তলায় এইরকম বিরাট পাহাড় দেখে তরুণ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। আর শুধু পাহাড় নয়, তার গায়ে নানা রকমের সামুদ্রিক-উদ্ভিদও রয়েছে।

ডক্টর লোহিয়া বললেন, তরুণ, খুব সাবধানে এসো, সমুদ্রের তলায় এইসব পাহাড়-অঞ্চল খুব বিপজ্জনক।

তরুণ বললে, আপনি আগে চলুন—আপনার পিছনে-পিছনে আমি যাবো। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, এখন আমরা কোনদিকে যাবো, পাহাড় তো আমাদের পথ আটকে দিলে?

লোহিয়া বললেন, এ-পাহাড় খুব দীর্ঘ নয়, ডানদিকে আরো-খানিকটা গেলেই শেষ হ'য়ে যাবে। তারপর আমরা আবার সোজা পথ পাবো।

ডক্টর লোহিয়া চলেছেন আগে আগে পথ দেখিয়ে, তাঁর পিছনে চলেছে তরুণ। পাহাড়ের তলায় ছোট-বড় নানা রকমের পাথরের ঢিবি—কোনটার উপরে পা দিয়ে, কোনটার বা নীচে পা দিয়ে তাঁরা চলেছেন। এদিকটা যেমন অন্ধকার, তেমনি নিস্তব্ধ, শুধু মধ্যে মধ্যে অদ্ভূত রকমের দু'একটা শব্দ এসে সেই নীরবতাকে যেন আরো ভয়াবহ ক'রে তুলছিল। তরুণ চমকে উঠে দু'একবার পিছনের দিকে তাকালে। তার মনে হচ্ছিলো, যেন কোনো শ্বাপদসঙ্কুল-অরণ্যের নিকট দিয়ে তারা চলেছে গভীর রাত্রে। বিপদ যে-কোনো মুহূর্ত্তে আসতে পারে।

সহসা ডক্টর লোহিয়া এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর তরুণের হাতটা চেপে ধ'রে তাকে দাঁড় করিয়ে মুখে শুধু শব্দ করলেন, ইস্-স্-স্-স্…

তরুণ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে, ব্যাপার কি ?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, চুপ ! শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ?

—হ্যাঁ। কিসের শব্দ বলুন তো ?

—চেয়ে থাকো, এখুনি বুঝতে পারবে। ব'লে ডক্টর লোহিয়া চুপ করলেন।...

তখুনি বীভৎস-চেহারার কতকগুলো জলজন্তু তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তরুণ বললে, ওগুলো কি ?

লোহিয়া বললেন, যদিও ওগুলোকে 'মাছ' বলা হয়, কিন্তু ওরা ভয়ঙ্কর মাছ - হাঙর ও তিমি জাতের। ওদের নাম, 'করাত-মাছ' 'রে মাছ', 'কুকুর-মাছ' প্রভৃতি। তবে হাঙর, তিমির চেয়ে এরা অনেক নিরীহ। বাঘ-সিংহীর কাছে যেমন চিতা, হায়না, ভল্লুক প্রভৃতি।

মিনিট-কয়েক পরে তাঁরা আবার চলতে শুরু করলেন। তরুণ এবারে কান খাড়া ক'রে আশে-পাশে দৃষ্টি রাখতে-রাখতে চললো। আবার নিস্তব্ধতা ! আবার অন্ধকার। ডক্টর লোহিয়া টর্চের আলোটা হাতে নিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে তরুণ চীৎকার ক'রে উঠল, স্যার ? আমার ডান পা-টা

[৮৮ পৃষ্ঠা

কিসে আটকে গিয়েছে, কিছুতেই টেনে তুলতে পারছি না। শীগ্‌গির আসুন।

সর্ব্বনাশ! ডক্টর লোহিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আলোটা তার পায়ের নীচে ফেলে চমকে উঠলেন। বিরাট এক সমুদ্রের ঝিনুক তার পা-টা গিলে ধরেছে!

তরুণ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললে, এ জানোয়ারটা কি? আমার পা-টা খেয়ে ফেলবে না তো?

লোহিয়া বললেন, নার্ভাস্‌ হ'য়ো না। শীগগির তুমি এই আলোটা ধরো, আর আমি ব্যাটারি চার্জ্জ-করা 'ইলেক্‌ট্রিক ড্রিলটা' ওর মাথায় চালিয়ে দিই—যেই ও মুখটা একটু ফাঁক করবে, অমনি তুমি প্রাণপণে পা টা টেনে নেবে···সবে ধরেছে, এখনো ভালো ক'রে গিলতে পারেনি।

তরুণের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল, তবুও মুখে সাহস দেখিয়ে বললে, আচ্ছা, আমি ঠিক আছি। আপনি তুর্পুনটা চালান।

ঘর্‌ঘর্‌-ঘর্‌ঘর্‌-ঘর্‌ঘর্‌-ঘর্‌ঘর্‌ ক'রে সেই ইলেক্‌ট্রিক-ড্রিলটা ঝিনুকের বিরাট খোলাটায় গর্ত্ত করতে-করতে চললো। হঠাৎ একসময় তরুণ ব'লে উঠলো, স্যার, আমার পা-টা বেরিয়ে এসেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তির আনন্দ তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হ'লো—

বেরিয়ে এসেছে? হাঁপাতে-হাঁপাতে ডক্টর লোহিয়া বললেন, একটু স'রে যাও ওখান থেকে, আমি ড্রিলটা খুলে নিচ্ছি।

খুলে নেওয়ার পর তরুণ বললে, ওটা কি জানোয়ার বলুন তো?

—চলো, দেখাচ্ছি। এই ব'লে ডক্টর আলোটা তার ওপর ফেলে বললেন, একরকমের ঝিনুক, সমুদ্রের মধ্যে গুহায় লুকিয়ে থাকে। দৈবাৎ যদি কোনো ডুবুরির পা তার ফাঁকে পড়ে, তবে ইঁদুর-কলের মত তখনি ওপরের খোলাটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ হ'য়ে যায়। ডুবুরির তখন সাধ্য থাকে না পা ছাড়িয়ে নেবার। মুক্তা তুলতে গিয়ে কত অভিজ্ঞ-ডুবুরিরা এইভাবে প্রাণ হারিয়েছে।

—ঝিনুক এত বড় হয়? বিস্মিতকণ্ঠে তরুণ প্রশ্ন করলে। এর খোলাটা তো দেখছি প্রায় পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা।

ডক্টর বললেন, হ্যাঁ, এর ওজনও বোধহয় পাঁচ-ছ'মণের কম নয়। খুব জোর বেঁচে গেছো। আবার যদি জাপান-সমুদ্রে যাও কোনদিন তো রাক্ষুসে-কাঁকড়া দেখে অবাক হ'য়ে যাবে। পনেরো ফুট, কুড়ি ফুট লম্বা তাদের এক-একটা দাড়া, একেবারে সাক্ষাত যম। তার সামনে গেলে আর রক্ষে নেই!

তারপর ডক্টর লোহিয়া, তরুণকে আগে দিয়ে নিজে পিছনে থেকে

তার সামনে আলো ফেলে চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর তরুণ একজায়গায় সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, স্যার, আবার যেন কিসের শব্দ আমাদের দিকে আসছে।

লোহিয়া দ্রুতস্বরে বললেন, কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে, বুঝতে পারছো কিছু?

তরুণ বললে, আমার মনে হ'চ্ছে স্যার, ডানদিক থেকে।

ডক্টর লোহিয়া তখন টর্চ্চের আলোটা সেইদিকে ফেললেন তারপর এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে তিনি হঠাৎ আলোটা নিবিয়ে দিয়েই সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, তরুণ, শীগ্‌গির মাটিতে শুয়ে পড়ো, হাঙর—হাঙর আসছে এইদিকে!

ঝপ্‌ ক'রে তরুণ সেইখানে শুয়ে পড়লো। ডক্টর লোহিয়াও তার পাশে শুয়ে রইলেন। ষ্টিমার চলে গেলে যেমন জলটা আলোড়িত হ'য়ে ওঠে, তেমনিধারা একটা প্রবল জলের বেগ তাদের মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। ডক্টর লোহিয়া তখন তরুণকে উঠে দাঁড়াতে বললেন।

তরুণ সভয়ে প্রশ্ন করলে, চ'লে গেছে?

—হ্যাঁ। হাঙরের সামনে পড়লে আর রক্ষেছিল না। একেবারে চিরে দিয়ে চ'লে যেতো। এদের অগুন্তি দাঁত শুধু যে অসম্ভব ধারালো ও জোরালো
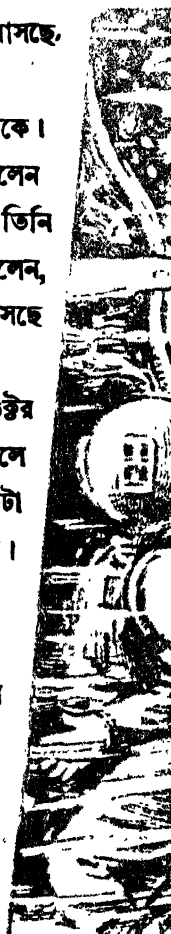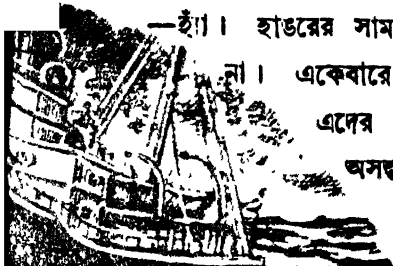
শুধু তাই নয়। সেগুলো আবার এমনভাবে তৈরি যাতে অত্যন্ত পিছল বস্তুও তার মধ্যে আট্‌কে যায়। সমুদ্রের মধ্যে এর মত হিংস্র জানোয়ার আর নেই।

তরুণ বললে, আমি স্পষ্ট দেখেছি স্যার, একটা লম্বা তীরের মত প্রাণী এদিকে ছুটে আসছিল, উঃ,…কি প্রকাণ্ড তার লেজটা!

ডক্টর লোহিয়া বললেন, হাঙরের সেরা হ'চ্ছে, 'থ্রেসার'-হাঙর। এগুলো লম্বা হয়, কুড়ি ফুট আন্দাজ। তার এগারো ফুট লেজ। এই লেজের বাড়ি মেরে সমস্ত জলটা আন্দোলিত ক'রে জীব-জন্তুদের তাড়া দেয়। আর এদের দাঁত? এক-কামড়ে আস্ত একটা মানুষকে অনায়াসে এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে ফেলতে পারে। হাঙরের দাঁতগুলো যেমন সরু, তেমনি ছুঁচলো। ছুটতে ছুটতে যাকে সামনে পায় একেবারে হাঁ ক'রে গিলে ফেলে, চিবোবার সময় পায় না।

তরুণ বললে, জলটা যেরকম তোলপাড় ক'রে দিয়ে গেল, তাতে মনে হয়, ওই 'থ্রেসার'-জাতীয় কোনো হাঙর হয়তো চলে' গেল।

ডক্টর লোহিয়া বললেন, বলা যায় না, হ'লেও হ'তে পারে। সমুদ্রগর্ভে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই।

এই ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, আজকের

যাত্রাটা ঠিক হয়নি, বারবার কেবল বিপদের মুখে পড়ছি। এক-দিনে একসঙ্গে এতগুলো বিপদের সম্মুখীন আর কখনো হইনি। চলো, আজ ফিরে যাওয়া যাক্, আবার কাল আসা যাবে।

তরুণ বললে, তাই চলুন। কিন্তু কাল কি আবার এই পথেই আসবেন?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, পাগল! এপথে এসে তো জাহাজের কোনো খোঁজই পেলুম না, কাল আবার অন্যদিকে দেখবো।

তরুণ বললে, সেখানেও যদি না পান?

—আবার অন্যত্র খুঁজবো। একবারে যদি পাওয়া যেতো তাহ'লে আর ভাবনা কি—কাজটা তো খুব সহজ হ'তো। জাহাজ যেখানে ডোবে সেইখানেই তো ব'সে থাকে না—সমুদ্রের টানে কোথা থেকে কোথায় চ'লে যায় তার কি কিছু ঠিক আছে। চলো, এখন আর কোনো দিকে না চেয়ে একেবারে ওপরের দিকে নজর রাখতে-রাখতে যাওয়া যাক্।

হঠাৎ একটু ওপরে উঠেই ডক্টর লোহিয়া থমকে দাঁড়ালেন এবং তরুণের হাতটা ধ'রে টানলেন। তরুণ কি-একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর 'টর্চলাইটটা' জ্বেলে ডানদিকে ধরলেন। তরুণ দেখলে, একটা জাহাজ সেখানে

প'ড়ে রয়েছে। ডক্টর লোহিয়া সোল্লাসে বললেন, ব্যস্, মার দিয়া, ওই তো জাহাজ, চলো এখন ওইদিকে।

তাঁরা ডানদিকে একটু যেতেই একেবারে জাহাজের ওপরে এসে পড়লেন। তখন পকেট থেকে জাহাজের ম্যাপটা বার ক'রে ডক্টর লোহিয়া ভাল ক'রে বুঝে নিলেন তার দরজা কোন দিকে এবং কোন দিক দিয়ে গেলে সহজেই সেই ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারবেন, যেখানে সোনা জমা ছিল।

টর্চ্চলাইট জ্বেলে তখন তাঁরা ঢুকে পড়লেন সেই জাহাজটার মধ্যে। তারপর সিঁড়িটা খুঁজে বার ক'রে ক্রমশঃ নীচে নামতে লাগলেন। ওপরের তলা ছেড়ে পরের তলায় গেলেন এবং তারপর তারপর করতে করতে একেবারে 'ডেকের' তলায় একটা অতি-সুরক্ষিত ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। এই ঘরটার ভেতরেই বড় বড় কয়েকটা লোহার সিন্দুক বোঝাই করা ছিল তাল-তাল সোনার রাশি।

অতি সাবধানে তরুণকে নিয়ে ডক্টর লোহিয়া সেখানে প্রবেশ করলেন। তারপর টর্চ্চলাইটটা জ্বালতেই দেখলেন, সারি সারি সেই সিন্দুকগুলো সেখানে বসানো রয়েছে। আনন্দে উৎসাহে তাঁর বুক তখন ফুলে উঠল। তিনি তরুণের হাতে আলোটা দিয়ে চামড়ার বড় ব্যাগটা কোমর থেকে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন,

তারপর একটা সিন্দুকের ডালা ধ'রে ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলেন, কোনদিক দিয়ে খোলা সহজ হবে। কিন্তু একি! ডালা ধ'রে একটু টান দিতেই সেটা খুলে গেল কেন? ডক্টর লোহিয়ার বুক যেন কিসের এক অজ্ঞাত-ভয়ে কেঁপে উঠল! খপ্ ক'রে তিনি দু'হাতে সিন্দুকের ডালাটা তুলে ধ'রে সেই সিন্দুকের মধ্যে মুখটা নীচু ক'রে দেখতে লাগলেন।

উন্মাদের মত ডক্টর লোহিয়া চীৎকার ক'রে উঠলেন, সোনা— সোনা কৈ? এই ব'লে যেমন আর-একটা সিন্দুকের ডালায় হাত দিলেন, অমনি সেটাও খুলে গেল আগের মত এবং সেটার মধ্যেও দেখলেন তেমনি কিছুই নেই। কোথায় গেল সোনা?

উত্তেজনায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। তারপর তিনি ক্ষিপ্রহস্তে একে-একে সব সিন্দুকগুলো তখন খুলে দেখলেন, কিন্তু কোথাও কোনো সোনার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পেলেন না। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

কি হ'লো সোনা!···গেল কোথায়?···নিলে কে? সেই অতল সমুদ্রের তলদেশেও কি তাহ'লে চোর আসে? এমনি নানা-রকমের সন্দেহ তখন তাঁর মনে উদয় হ'লো। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কখনো তো এমন আশ্চর্য্য কথা শোনেন নি!

এইসব ভাবতে-ভাবতে তিনি সারা জাহাজটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু জাহাজের কোথাও আর কোনো পরিবর্ত্তন ডক্টর লোহিয়ার চোখে পড়লো না। যেখানে যেটি থাকা দরকার সবই ঠিক-ঠিক সাজানো আছে।

তরুণ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, কি হ'লো? সোনা তো পাওয়া গেল না—তাহ'লে কি হবে স্যার?

ডক্টর লোহিয়া, চিন্তাক্লিষ্টমুখে বললেন, হুঁ, তাইতো ভাবছি!

তরুণ আবার প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আমরা চুরি করেছি, একথাও তো যাদের জাহাজ তারা মনে করতে পারে?

লোহিয়া বললেন, পারে, কিন্তু তারও ব্যবস্থা আছে। আমাদের সঙ্গেই তাদের একজন বড় অফিসার এসেছেন, তিনি আমাদের জাহাজে ব'সে রিপোর্ট লিখছেন। তাঁর কাছে গিয়ে সব জানাতে হবে, তাহ'লেই আর সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো দোষ থাকবে না।

তরুণ জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, পাওয়া না গেলে তাঁরা কি করবেন?

—কি করবেন বলা খুবই সহজ—কেননা, এতগুলো টাকার সোনা কেউ এমনি ছেড়ে দেবে না।

তরুণ বললে, কিন্তু না দিয়েই বা উপায় কি? সমুদ্রের মধ্যে

হয়তো কোথাও স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে—তাও তো হ'তে পারে?

একটু হেসে লোহিয়া বললেন, না, তা' হ'তে পারেনা—কেননা, যে-লোহার সিন্দুকগুলোয় সোনা ভর্ত্তি ছিল, সেগুলো রয়েছে, অথচ তার ভেতর থেকে কি আপনা-আপনি সোনার তালগুলোর পাখা গজালো?

তরুণ বললে, তাহ'লে কি হবে স্যার?

কি আর হবে! যাদের জিনিস, তারা যখন শুনতে পাবে যে, ওখান থেকেও চুরি হয়েছে, তখন তারা পুলিশে খবর দিয়ে এর একটা বিহিত করবে?

তরুণ বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, পুলিশরা এখানে আসবে কেমন ক'রে?

ডক্টর লোহিয়া ঈষৎ হেসে বললেন, যেমন ক'রে আমরা এসেছি? তা-ছাড়া একরকম ছোট-ছোট জাহাজ আছে, সেগুলো জলের নীচে চলে, তাদের নাম, 'সাবমেরিণ' বা ডুবোজাহাজ, তা' বোধহয় তোমার জানা নেই?

তরুণ বললে, ওঃ, বুঝেছি। সেইসব সাবমেরিণ থেকেই তো গুলি ক'রে শত্রুরা এখন যুদ্ধের জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এইতো সেদিন চারখানা খাদ্য-বোঝাই জাহাজ শত্রুরা ডুবিয়ে দিলে।
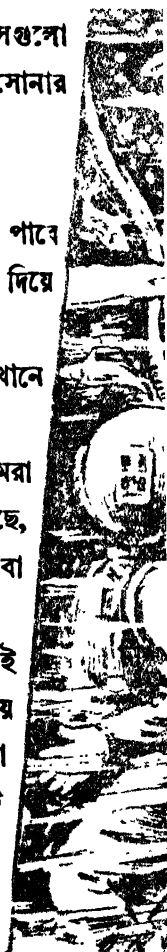
ভারতবর্ষ থেকে চাল বোঝাই হ'য়ে কোথায় যাচ্ছিলো, না? তারপরে সেদিন আমি খবরের কাগজে পড়লুম, জার্মানীর সৈন্যবোঝাই কতকগুলো জাহাজ ইংরেজরা ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা স্যার, এই যুদ্ধের পর বোধহয় হাজার-হাজার জাহাজ সমুদ্রের তলা থেকে বেরুবে, না?

ডক্টর লোহিয়া বললেন, সেইসময় আমাদের কোম্পানীর কাজ সবচেয়ে বাড়বে। এখন সমুদ্রের চারিদিকে শত্রুপক্ষের সাবমেরিণ ও 'মাইন' পাতা, কখন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগবে তা কে জানে! তবুও যে এখন এই কাজ করবার জন্যে এখানে এসেছি, তাও খুব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে! তবে এ-এলাকায় এখনো শত্রুরা আসেনি এবং আমেরিকার। সতর্ক-প্রহরী-জাহাজ আমাদের চারদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে, তাই।

এইসময় তরুণ জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা স্যার, আমাদের তো এখন কোনো ভয় নেই?

—না। ভয় কিসের!

এইরকম সব আলাপ-আলোচনা করতে-করতে তাঁরা দু'জনে তখন সমুদ্রগর্ভ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে আলোর রাজত্ব পেরিয়ে তাঁরা অন্ধকারে এসে পড়লেন। তাঁরা দু'জনে যেমন বরাবর গল্প

করতে-করতে আসছিলেন, এখানেও ঠিক তেমনিভাবে চলতে-চলতে হঠাৎ তরুণের মনে হ'লো, যেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডক্টর লোহিয়া কোনো কথা বলেন নি, সে একাই তাঁকে নানারকমের কথা বলতে-বলতে চলেছে। তাই মুহূর্ত্তকয়েক চুপ ক'রে থেকে সে প্রশ্ন করলে, আপনি কি ভাবছেন বলুন তো স্যার? আমি একা-একা বকে মরছি আর আপনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে বেশ চুপচাপ আছেন। অন্ধকারে আমার বড় ভয় করছে যে! আচ্ছা, যাবার সময় কত আলো-মাছ দেখেছিলুম, কিন্তু এতটা পথ এলুম, কৈ, এবার একটাও তো নজরে পড়লো না? মাছেরা সব গেল কোথায়?

কোনো উত্তর নাই! সব চুপচাপ।

তরুণ ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলে, ডক্টর লোহিয়া, আপনি চুপ ক'রে আছেন কেন?

আবার সব নিস্তব্ধ! কোথাও কোনো সাড়া নাই। সেই অনন্ত সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে কি এক-রকমের অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত আওয়াজ শুধু তার কানে এসে বাজতে লাগলো।

এইবার তরুণ ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল এবং ডক্টর লোহিয়ার নাম ধ'রে বার-বার ডাকতে লাগলো।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

সহসা নিকটে একটা দারুণ শব্দ শুনে তরুণ চমকে উঠল এবং চোখ চাইতেই যা দেখলে তাতে ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে গেল। দেখলে, কোন যাদুমন্ত্রে সে একেবারে একটা পাহাড়-ঘেরা কঠিন দুর্গের মত জায়গায় এসে পড়েছে···তার মধ্যে থেকে পালাবার আর কোনো পথ নেই! তার চারিদিকে অসংখ্য ঘর আর সেইসব ঘরের কোনটায় তালতাল সোনা, কোনটায় রাশিরাশি গোলা বারুদ, কোনটায়-বা সিন্দুকভরা আরো কত কি জিনিস রয়েছে।

কোন্‌দিকে দরজা? অনেক অনুসন্ধান ক'রেও না পেয়ে শেষে সে ছুটোছুটি করতে লাগলো তার মধ্যে। বহুক্ষণ চেষ্টা করবার পর একজায়গায় ফটকের মত বিরাট একটা দরজা দেখতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। তারপর পা টিপে-টিপে যেমন সে তার কাছে এগিয়ে গেল, অমনি দেখলে, সেই ফটকের ফাঁকের ওপর ডক্টর লোহিয়ার রক্তাক্ত মৃতদেহ ঝুলছে!

উঃ! কে এ-কাজ করলে রে? ব'লে তরুণ ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে একজন ভারী-গলায় ব'লে উঠল, আমি।

—কে তুমি? তরুণ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলে।

সে বললে, আমি এই দুর্গের [illegible]।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

তরুণ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, কিন্তু কেন তুমি একাজ করলে! ডক্টর লোহিয়া তো তোমার কোনো অনিষ্ট করেনি!

সে বললে, আমার অনিষ্ট করেছে কিনা সেকথা তোমাকে আমি কি ক'রে বোঝাবো! তা'ছাড়া তোমার সেসব কথায় কি দরকার? আমি তোমায় এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। এই ব'লে একটু থেমে সে আবার বললে, তুমিও মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, আর মাত্র পাঁচমিনিট তোমায় সময় দিলুম।

তরুণ বললে, আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু কেন মরছি সেটা জানতে পারলে আরো শান্তিতে মরতে পারতুম। বিনা দোষে, বিনা অপরাধে কেন মানুষ মানুষের প্রাণ নেয়, সেটা জানতে পারলেও আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হতো!

—বিনা অপরাধে কেউ কারুর প্রাণ নেয় না। তবে শোনো, কেন তাকে হত্যা করেছি এবং কেন তোমায়ও হত্যা করতে হবে। অবশ্য, তোমাকে সেকথা এখন বলতে কোনো দোষ নেই, কেননা তুমি তো এখুনি মরবে, সেকথা তো আর কেউ শুনতেও পাবে না তোমার মুখ থেকে। এই ব'লে একটুখানি থেমে সে আবার শুরু করলে, তবে বলি শোনো—আমরা হ'চ্ছি ডাকাত, তবে পৃথিবীর ওপরে থাকি না, থাকি সমুদ্রের তলায়। এই পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে কেমন
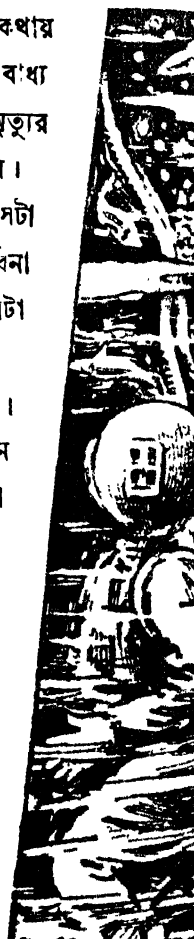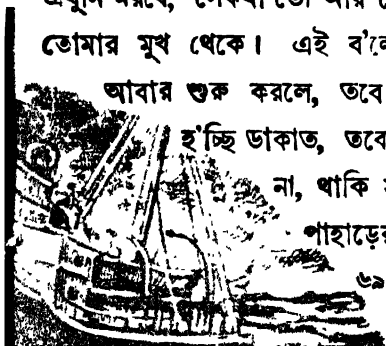
ঘর-বাড়ী তৈরি ক'রে বাস করছি—দেখতে পেলে তো? পৃথিবীর নানা দেশের বড়-বড় বৈজ্ঞানিক-দস্যুরাও আমাদের দলে আছে—তারাই এই সমুদ্রের তলায় বুদ্ধি ক'রে এইরকম সুদৃঢ় প্রাসাদ বানিয়েছে। কত ধনরত্ন, সোনাদানা সব ঘরে-ঘরে প'ড়ে রয়েছে দেখলে তো? পুলিশের সাধ্য নেই যে, এখান থেকে আমাদের খুঁজে বার করে। তারা আমাদের ধরবার জন্যে কত চেষ্টা করছে দেখে হাসি পায়! আরে, এটা যে বিজ্ঞানের যুগ! বৈজ্ঞানিকরা প্রতি মুহূর্তে কত অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করছে তাতো জানো? আমরা তো পুলিশের মত বোকা নই। ছাখো না, বিশবছর আগে তারা যেমন ক'রে চোর ধরতো, আজও তেমনি ক'রে ধরবে ব'লে ব'সে আছে! তারা জানে না যে, জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, সমস্ত পৃথিবী আজ আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে—তাই সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন আহরণ ক'রে এনে আমরা এইখানে রেখেছি। এ-খবর এখনো পর্য্যন্ত বাইরের লোক কেউ জানে না। আর জানলেই আমাদের বিপদ, তা' বোধহয় বুঝতে পারছো?

তরুণ বললে, কিন্তু আমরা তো তোমাদের আড্ডার খবর জানতুম না—

সে বললে, আরে, শোনো—

শোনো ছোকরা, অত ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমরা যে জানবে না তা জানি। কিন্তু তোমরা যে-ডুবোজাহাজের লুপ্ত-সম্পত্তি উদ্ধার করতে এসেছিলে, আমরা তো তার সবই নিয়ে এসেছি। এখন যুদ্ধের সময় এইসব ডুবো-জাহাজের ধনরত্ন কামান বন্দুক গুলিগোলা সব আমাদের সম্পত্তি। কাজেই, তোমরা যখন সোনা পেলে না, তখন নিশ্চয়ই গিয়ে এখুনি আমেরিকার সেই কোম্পানীকে জানাবে, আর তাহ'লে তারা কি চুপ ক'রে থাকবে? তৎক্ষণাৎ তারা এই লুপ্ত-সম্পত্তি কারা চুরি করেছে তার সন্ধানে পুলিশ নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগবে। তাহ'লে একদিকে যেমন আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসারও ক্ষতি! তাই, যাতে পৃথিবীর কোনো লোক আমাদের সন্ধান না জানতে পারে তার জন্যে আগে ডক্টর লোহিয়াকে হত্যা করেছি—এইবার তোমাকে করবো।

তরুণ বললে, কিন্তু, আমাদের জাহাজে তো আরো কত লোকজন রয়েছে, আমরা না ফিরে গেলে তারা তো বুঝতে পারবে। তখন কি করবে?

সে বললে, সে-পথও মেরে দিয়েছি, ছোক্‌রা! আমাদের কি এত বোকা ভাবো?

তরুণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি করেছো?
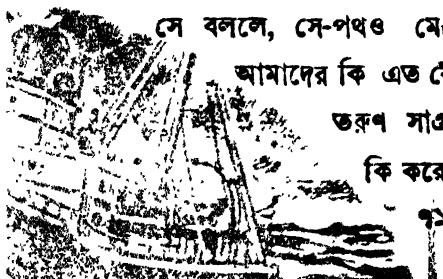
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ক'রে বীভৎস হাসি হেসে উঠে লোকটা বললে, কি আর করবো ? একটা জিনিস আমরা করতে জানি এবং তাই করেছি। সেই জাহাজখানাকে ডুবিয়ে দিয়ে সকলকে মেরে ফেলেছি অনেক আগে। তারপর তোমাদের নলগুলো ধ'রে টানতে-টানতে এমন কৌশলে এখানে নিয়ে এসেছি যে, তোমরা কেউ জানতেই পারোনি। এই ব'লে সে তার কোমর থেকে একটা রিভলভার বার ক'রে তার দিকে তুলে ধ'রে বললে, নাও, প্রস্তুত হও। আমি ওয়ান্—টু—থ্রী বলবো শুধু।

তরুণ কম্পিতকণ্ঠে বললে, প্রস্তুত আবার কি ক'রে হ'তে হবে ? এই তো আমি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ব'লে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

এক ধমক দিয়ে লোকটা বললে—চুপ্‌!

তরুণ সঙ্গে-সঙ্গে চুপ্ করলে।

তখন সে তরুণকে তার মুখোস ও ডুবুরির পোষাকগুলো খুলে ফেলতে বললে।

তরুণ কম্পিতহস্তে একে-একে সব খুলে ফেললে। শেষে যেই মুখোসটা খুলছে, অমনি সে লোকটি ছুটে এসে তরুণকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—তরুণ ? তুমি ? তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?

তরুণ বিস্মিত-চোখে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সে বললে, ও, তুমি বুঝি এখনো আমাকে চিনতে পারছো না? এই ছাখো, আমি মাথার পাগ্‌ড়ী খুলে ফেললুম!

তরুণের মুখ দিয়ে তখন শুধু অস্ফুটস্বরে ছ'টি কথা বেরুলো—ও, মোহনসিং ··তুমি?

সে বললে, হ্যাঁ তরুণ, আমি।

কিন্তু এখানে আর দেরী নয়। তুমি শীগ্‌গির পালাও— আমাদের দলের কেউ এখানে নেই তাই রক্ষে! এখুনি যদি কেউ এসে পড়ে তাহ'লে তোমায় মরতেই হবে। আমি শত চেষ্টা করলেও তোমায় বাঁচাতে পারবো না।

তরুণ বললে, কিন্তু আমি তো পথ চিনি না, কি ক'রে পালাবো? এই বিশাল সমুদ্রের তলায় ডক্টর লোহিয়াই আমায় প্রথম নিয়ে আসেন!

একমুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে মোহনসিং বললে, আচ্ছা, শীগ্‌গির তোমার ডুবুরির পোষাকটা প'রে নাও—আমি ডুবো-জাহাজ নিয়ে আসছি, তাতে ক'রে তোমায় যমগুহারবারের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো, তুমি সেখান থেকে কলকাতায় তোমার মা'র কাছে চ'লে যেয়ো!

মায়ের নাম শুনেই তরুণের চোখে জল এসে পড়লো। সে বললে,

জানিনা, মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা। আজ তিন বছর তাঁর কোনো খবরই জানি না।

মোহনসিং সাগ্রহে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে, তিনি বেঁচে আছেন তো?

কেমন ক'রে বলবো! ভগবান জানেন।

আরে, ঠিক আছে। বাড়ী গেলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে! ঘাবড়িয়ো না! এই ব'লে সে সেখান থেকে চ'লে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা সাবমেরিন এনে তার মধ্যে তরুণকে তুলে নিয়ে অতলের উপরের পথে তীব্রবেগে রওনা হ'লো। ডায়মণ্ডহারবারের উপকূলে তাকে তুলে দিয়ে মোহনসিং শুধু বললে, খবরদার, এখানকার সংবাদ যেন কেউ না জানতে পারে। তোমায় শুধু আমি ভালোবাসি ব'লে এতখানি দায়িত্ব নিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেলুম। তোমার হাতে এখন আমাদের সকলের জীবন। খুব সাবধান। কাউকে— এমন কি তোমার মাকেও যেন এখানকার কথা ব'লো না। এই ব'লে কয়েকটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হ'লো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বহুদিন পরে তরুণ বাড়ী ফিরলো। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কত কাঁদতে লাগলেন। তারপর কোথায় সে এতদিন ছিল এবং কি খেয়েছে, কি করেছে সেইসব কথা একটি-একটি ক'রে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

তরুণ সব বললে, শুধু মোহনসিংয়ের কথাটা চেপে গেল।

তার মা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে মোহনসিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছিল কিনা, তখন সেও অবাক! বললে, মোহনসিংয়ের সঙ্গে আমি পালাবো কেন?

গৌরীশঙ্করবাবু, তাঁর স্ত্রী ও চেরী সবাই এতক্ষণ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিলেন। এইবার গৌরীশঙ্করবাবু বললেন, কিন্তু তুই যেদিন থেকে বাড়ী ছেড়েছিস, সেইদিন থেকেই তো মোহনসিং পলাতক। তারপর সে যে কত বড় ডাকাতের সর্দ্দার এবং এতদিন ধ'রে তাদের সম্বন্ধে কাগজে যা যা বেরিয়েছে তার কাছে সমস্তই গল্প করলেন।

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় তরুণের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠল। তবু সে প্রাণপণে মোহনসিংয়ের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের কথাটা চেপে রইলো।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

একদিন, দু'দিন, ক'রে দু'মাস কেটে গেল। তখনো কিন্তু সে মোহনসিংয়ের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করেনি।

গৌরীশঙ্করবাবু তাকে প্রতিদিন নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে একবার ক'রে বলেন, যদি তুই তার খবর বলিস তো গভর্ণমেণ্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। সে তোর কে? কেনই বা বলবি না? এই পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে কলকাতায় বড়-বাড়ী আর গাড়ী হাঁকিয়ে তোর সারাজীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে—তোর মাকেও আর দাসীবৃত্তি করতে হবে না লোকের বাড়ী-বাড়ী। তুই তার ছেলে। অন্ততঃ মায়ের মুখ চেয়েও এটা করা উচিত তোর, তুই ভাল ক'রে ভেবে দেখ্!

এদিকে তরুণের মাকেও গৌরীশঙ্করবাবু শিখিয়ে দিয়েছিলেন, মোহনসিং কোথায় আছে সেই খবরটা বার ক'রে নিতে। আর এ-কথাটাও ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই কথাটা বার ক'রে নিয়ে গভর্ণমেণ্টকে দিতে পারলে চিরজীবন তারা বড়লোকের মত নবাবী ক'রে কাটিয়ে দিতে পারবে। কথাটা তিনি তরুণের মাকে প্রতিদিন একবার ক'রে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলতেন না।

শুধু গৌরীশঙ্করবাবু কেন, তরুণের মায়ের মনেও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, 'তরুণ সব খবর জানে অথচ চেপে যাচ্ছে।

হাজার হোক্, তরুণ ছেলেমানুষ

এত টাকার প্রলোভন সে আর কতদিন চেপে থাকতে পারে। তাও হয়তো পারতো, কিন্তু মায়ের দুঃখ চিরজীবনের মত ঘুচবে শুনে সে আর থাকতে পারলে না, শেষে একদিন গৌরীশঙ্করবাবুর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে গিয়ে সমস্ত গুপ্ত খবরটাই পুলিশের কাছে সে প্রকাশ ক'রে এলো।

আশ্চর্য্য! সেই খবরটা দিয়ে যখন গৌরীশঙ্করবাবু ও তরুণ লালবাজার থেকে বেরিয়ে এলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। তাঁরা গিয়েছিলেন বেলা এগারোটার সময়, কিন্তু এতবড় একটা ব্যাপারের খবর জানাতে সেখানে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়! এতবড় চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো যুগে কখনো সম্ভব হয়নি! তাই গৌরীশঙ্করবাবু যখন পুলিশকমিশনার সাহেবের ঘরে গিয়ে তরুণকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলেটির সঙ্গে হঠাৎ মোহনসিংয়ের দেখা হয়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে, তখন বিস্ময়ে তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। সাহেব তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চাননি, তারপর একে-একে যখন তরুণ তার অভিযানের সম্পূর্ণ কাহিনীটা তাঁর কাছে বিবৃত করলে তখন আর তাঁর মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। তিনি তখুনি তাঁর অধীনস্থ সমস্ত বড়-বড় গোয়েন্দাদের

তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। মোহনসিংয়ের খবর পাওয়া গেছে—একথা শোনামাত্র যিনি যে-অবস্থায় ছিলেন হন্তদন্ত হ'য়ে একেবারে সাহেবের ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন। তারপর সাহেবের মুখে সব কাহিনী শুনে সবাই বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এরপর তরুণকে নিয়ে চললো হাজার রকমের জেরা! কোথায়, কবে, কেমন ক'রে তারা গিয়েছিল···তরুণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কোথায়···তরুণের বাপ মা থেকে শুরু ক'রে চৌদ্দপুরুষের নাম সব লিপিবদ্ধ ক'রে নিলেন অনেকগুলি লোক তরুণকে ঘিরে ব'সে একটা ঘরে। সেইসঙ্গে গৌরীশঙ্করবাবুও অবশ্য বাদ গেলেন না। তাঁরও চৌদ্দপুরুষের হিসেব-নিকেশ তাঁদের দিতে হ'লো এবং তাঁরা সবই লিপিবদ্ধ ক'রে নিলেন।

তরুণকে তাঁরা গৌরীশঙ্করবাবুর সঙ্গে সেদিন বাড়ী ফিরে যেতে দিতে প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে, আবার কাল যথাসময়ে তিনি তরুণকে সঙ্গে ক'রে অফিসে এসে দেখা করবেন, তখন পুলিশকমিশনার সাহেব একটু হেসে বললেন, এটা অবশ্য আমাদের আইনে বলে না, তবে আপনি যখন আমাদের এতটা উপকার যেচে করলেন তখন

আপনাকে এ-সুবিধাটুকু দিলাম অবশ্য আমার নিজের দায়িত্বে।

তারপর তরুণের খুব পিঠ চাপড়ে, তার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে সাহেব বললেন, তুমি ভারী ভাল ছেলে। একদিন তুমি খুব বড় হবে এ-আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি! এই ব'লে তখন সাহেব তাঁর নিজের মোটরগাড়ীতে ক'রে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু গাড়ী লালবাজার থেকে বেরিয়ে যেই চীৎপুরের মোড়ে এসেছে, অমনি 'দ্র্যাম্' ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে মোটরগাড়ী ভেদ ক'রে একটা গুলি তীরবেগে গৌরীশঙ্করবাবুর কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের মাথায় লাগলো। ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ ছট্‌ফট্ করতে-করতে মরে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা লোকে-লোকারণ্য হ'য়ে উঠল! তখন থানা থেকে 'মোটরবাইক' ক'রে বহু পুলিশ সার্জ্জেন্ট এসে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লো। তারপর আবার তরুণকে ও গৌরীশঙ্করবাবুকে নিয়ে তারা পুলিশকমিশনারের কাছে গেল।

গৌরীশঙ্করবাবু তখন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, সাহেব, আমি বাড়ীতে কিছুতেই একা থাকবো না।

সাহেব বললেন, কোনো ভয় নেই, আমি এখুনি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, আপনার বাড়ীটা পাহারা দেবার জন্যে। ছদ্মবেশে বহু সশস্ত্র-পাহারা থাকবে আপনার বাড়ীর চারিপাশে।

গৌরীশঙ্করবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে তখন বাড়ী ফিরলেন। তরুণের মনে কিন্তু কেমন একটা আতঙ্ক জাগলো। তার গা ছমছম্ করতে লাগলো বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে গিয়ে।

গৌরীশঙ্করবাবু তখন তাকে বোঝাতে লাগলেন, কোনো ভয় নেই, পুলিশকমিশনার সাহেব নিজে যখন ভার নিয়েছেন আমাদের বাড়ী পাহারার—তখন কারো ঘাড়ে এমন মাথা নেই যে, আমাদের বাড়ীর ছায়া নাড়াতে সাহস করবে।

এই কথা শুনে তরুণের বুকে তখন যেন অনেকটা সাহসের সঞ্চার হ'লো। তবু সে সারা রাত মায়ের বুকের মধ্যে জড়সড় হ'য়ে শুয়ে রইলো। কেবলই তার মনে হ'তে লাগলো, কাজটা হয়তো ভাল হ'লো না—মোহনসিং তাকে বারবার বারণ করেছিল একথা যেন সে কাউকে না বলে।

পরের দিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ কোলাহল শুনে গৌরীশঙ্করবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবেন এমন সময় তরুণ ছুটতে ছুটতে এসে বললে,

এই বাড়ীর দ্বারোয়ানটাকে কাল রাত্রে কে ছোরা মেরেছে ‥ সে মরে প'ড়ে আছে ফটকে…তার সারা দেহ রক্তাক্ত।

এই খবরটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে গৌরীশঙ্করবাবুর মুখটা কালীবর্ণ হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি নীচে নেমে গেলেন তখন তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টায়।

এগারোটার সময় যথারীতি তিনি আবার তরুণকে নিয়ে পুলিশকমিশনারের অফিসে গেলেন এবং প্রথমেই তিনি দ্বারোয়ানের মৃত্যুর সংবাদটা দিলেন। পুলিশকমিশনার সাহেব বললেন, কিন্তু আপনার বাড়ীর চারিদিকে তো সশস্ত্র পুলিশ কাল সারা রাত ছদ্মবেশে পাহারা দিয়েছে!

গৌরীশঙ্করবাবু বললেন, তাইতো আরো অবাক হ'চ্ছি যে, এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে কি হ'লো! নিশ্চয়ই কোনো লোক এসেছিল এবং বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল, তাই বাধা দিতে গিয়ে বেচারীর প্রাণ গেল। এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, আমিই তাকে ক'দিন রাত্রে একটু বেশী সতর্ক থাকবার জন্যে ব'লে দিয়েছিলাম!

পুলিশকমিশনার সাহেব মিনিটকতক চুপ ক'রে থেকে পার্শ্বস্থিত টেলিফোনটা তুলে নিয়ে তখুনি কার সঙ্গে কি কথা কইলেন।

তারপর আবার তরুণের সঙ্গে

মোহনসিংয়ের ফাঁস

গোয়েন্দাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হ'লো। গোয়েন্দাদের বড়সাহেব বললেন, বোম্বের অফিস থেকে খবর পেয়েছি, ডক্টর লোহিয়ার ওখান থেকে তারা একটা মানচিত্র সংগ্রহ করেছে, তাতে তিনি ঠিক কোন্ স্থানে ডুবোজাহাজটা খুঁজতে গিয়েছিলেন তার চিহ্ন দেওয়া আছে।

তরুণ বললে, সেইখান থেকে বরাবর সমুদ্রের তলায় নেমে যেতে হবে, তারপর ওঠবার পথে যেখানে খুব অন্ধকার, সেইখানে আছে কতকগুলো পাহাড়, তার মধ্যে বিরাট-বিরাট কয়েকটা ঘরে তাদের আড্ডা!

তখন একজন প্রস্তাব করলেন, আচ্ছা, তরুণকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো ব্যাপারটা সহজে মিটে যায়!

তরুণ কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজী হ'লো না। বললে, না। আমার ভয়ানক ভয় করে, আমি আর সেখানে যেতে পারবো না।

গৌরীশঙ্করবাবু বললেন, তা'ছাড়া ছেলেমানুষ, তারওপর মায়ের এক ছেলে। এই এতদিন পরে ফিরেছে, ওর মা কিছুতেই এ-প্রস্তাবে রাজী হবে না।

তখন বড়সাহেব বললেন, আচ্ছা, থাক্। আমরা ওর বর্ণনা অনুযায়ী একটা 'প্ল্যান' এঁকে নিচ্ছি, তাই নিয়েই কাজ শুরু করি। এইভাবে আবার তাঁদের

মোহনসিংয়ের ফাঁস

সেদিনের কাজ শেষ হ'তে বেলা সাড়ে-ছটা বাজলো। তখন বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে দিয়ে তাদের বাড়ীতে পৌঁছবার ব্যবস্থা তাঁরা ক'রে দিলেন। কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই গৌরীশঙ্করবাবু শুনলেন, তাঁর ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে···ব্যাপার কি! তরুণ শুষ্কমুখে একবার মনিবের মুখের দিকে তাকিয়েই সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে-ছুটতে ওপরে উঠে গেল। গৌরীশঙ্করবাবুও উর্দ্ধশ্বাসে তার পেছনে-পেছনে ছুটলেন। স্বামীকে দেখেই গৌরীশঙ্করবাবুর স্ত্রী চীৎকার ক'রে উঠলেন, ওগো, চেরীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল?

এ্যাঁ! সে কি? ব'লে তিনি প্রথমটা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

স্ত্রী বললেন, সে খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা যেমন রোজই আমার কাছে শুয়ে ঘুমোয় তেমনি ঘুমচ্ছিলো, কিন্তু আমি যেমন একটু—বোধহয় আধঘণ্টাটাক চোখ বুজে উঠেছি, দেখি, আর সে আমার পাশে নেই। মনে করলুম হয়তো এঘরে-ওঘরে কোথাও গেছে, কিন্তু যত দেরী হয় দেখি সে আর আসে না! তখন ওপর-নীচে তন্নতন্ন ক'রে খোঁজ করেও কোথাও তার সন্ধান

পেলুম না। কি হবে গো! এদিকে তো সন্ধ্যে হতেও আর বেশী দেরী নেই! কোথায় গেল আমার মেয়ে! এই ব'লে তিনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন।

গৌরীশঙ্করবাবু তখুনি আবার ছুটলেন পুলিশে এবং পুলিশকমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সব জানালেন।

তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এ তাদেরই দলের কাজ। আচ্ছা, আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি, আপনি ঘাবড়াবেন না—আমি এখুনি ঘেরাও ক'রে ফেলছি শহরটা—কোথাও তারা পালাতে পারবে না। এই ব'লে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কেবল আপনার মেয়ের যদি কোনো ফটো থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন একখানা।

চেরীর জন্যে তরুণের মনটাও ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। সত্যি সে ছিল তার খেলার সাথী! সে চুপ ক'রে বারান্দার এক কোণে ব'সে ভাবছিল অতীত দিনের কত কথা! এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে গৌরীশঙ্করবাবু সেখানে এসে বললেন, জানো তরুণ, এ সেই ব্যাটাদের কাজ, কমিশনার সাহেব বললেন।

তরুণ বললে, মিছিমিছি ওদের ঘাঁটাতে না গেলে হ'তো! টাকার লোভ করতে গিয়েই এই সর্ব্বনাশটা হ'লো।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

গৌরীশঙ্করবাবু তখন রেগে উঠে বললেন. তা'বলে এইসব অন্যায় সহ্য করতে হবে ? এইসব বদমায়েসগুলো কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করছে একবার ভেবে দেখ দেখি ?

তরুণ একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে, তাহ'লে ঠিকই হয়েছে, কি বলেন ;

—নিশ্চয়ই !

পরের দিন আবার তরুণের ও গৌরীশঙ্করবাবুর পুলিশ-কমিশনারের অফিসে দেখা করবার কথা ছিল। তাঁরা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তে গোয়েন্দারা সবাই চেরীর অদৃশ্য হওয়ার কাহিনীটা শুনে অবাক হ'য়ে গেলেন। কি দুর্দ্দান্ত সাহস ! একজন বললেন, আমার মনে হয়, ওই বাড়ীটার মধ্যেই তাদের দলভুক্ত কেউ আছে। এই ব'লে গৌরীশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো লোকের ওপর কি আপনাদের কোনো সন্দেহ হয় ?

তিনি বললেন, কি জানি মশায়, তিনশো ছাপান্ন ঘর ভাড়াটে যে-বাড়ীতে—সে-বাড়ীর লোক কে কিরকম তা' বুঝবো কেমন ক'রে !

তখন একজন বললেন, আমার মনে হয়, তরুণ যদি আমাদের সঙ্গে আর-একবার সমুদ্রের তলায় যেতে পারতো তাহ'লে ব্যাপারটা আরো তাড়াতাড়ি শেষ হতো।

গৌরীশঙ্করবাবুর এবার উৎসাহ দেখা গেল। তিনি তরুণকে সেইখানেই অনুরোধ করলেন। চেরীর কথা ভেবে তরুণ সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হ'য়ে গেল। কথা রইলো, কাল সকাল দশটায় সে অফিসে এসে তাদের সঙ্গে রওনা হবে, বোম্বাই।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই বাড়ী থেকে তরুণ ও গৌরীশঙ্করবাবুকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা দু'জনে একখানা ট্যাক্সি ক'রে বাজারে কয়েকটা জামা কিনতে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি! ট্যাক্সিওয়ালাটা যে সেই দস্যুদের দলভুক্ত ছিল তা' ওঁরা কি ক'রে জানবেন! খুব কম ভাড়ায় ট্যাক্সিওয়ালাটা রাজী হওয়াতে ওঁরা ভেবেছিলেন খুব জিতেছেন, কিন্তু যখন বড়বাজার-অঞ্চলের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন একখানা বাড়ীর ফটকের মধ্যে গিয়ে গাড়ী থামলো তখন ওঁদের হুঁস হ'লো। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার—শহরের সমস্ত গলিগুলো যেন অন্ধকারে থমৃথম্ করে! তাই ভালোভাবে বোঝবার আগেই ওঁরা দেখলেন যে, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ওঁরা বন্দী!

পরের দিন সকাল দশটায় তরুণের যাত্রা করার কথা গোয়েন্দাদের সঙ্গে। এদিকে গৌরীশঙ্করবাবুরও বাড়ীতে এমন কোনো পুরুষমানুষ নেই যে, তাদের খোঁজ করে, পুলিশের অফিসে ছুটোছুটি করে বা

তদ্বির করে। অথচ চেরীর শোকে গৌরীশঙ্কর মুহ্যমান, তখনো পর্য্যন্ত তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কি হবে! কেমন ক'রে এই শত্রুপুরী থেকে নিষ্কৃতি পাবেন তাই ভাবতে গিয়ে তাঁর মাথা তখন উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল। ভয়ে তরুণের মুখও বিবর্ণ। একি অবস্থায় পড়লো তারা! এখন কি হবে! ভাবতে গিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো, জিবটা শুকিয়ে যেন গলার মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম নিস্তব্ধ! বিরাট একটা চারতলা বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে যেন ভূতের বাড়ীর মত। তার কোনো ঘরে কোনো আলো নেই, কোথাও কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর নেই!

পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলো তরুণ—গৌরীশঙ্করবাবু তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে তেমনিভাবে চীৎকার করতে-করতে বন্ধ-দরজাটায় দুম্‌দাম্‌ ক'রে লাথি মারতে লাগলেন।

কিন্তু তবুও কোনো মানুষের গলার আওয়াজ বা পায়ের শব্দ কোথাও শোনা গেল না। তরুণ তখন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। গৌরীশঙ্করবাবু তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন। অনুশোচনায় দু'জনেরই বুকের ভেতরটা তখন পুড়ে যাচ্ছে—কেন মিছিমিছি যেচে
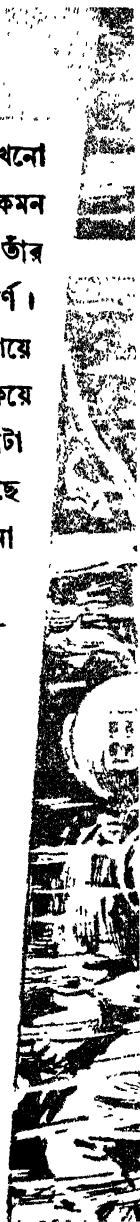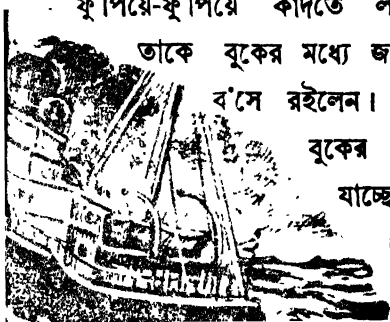
মোহনসিংয়ের ফাঁস

এই অভিসম্পাত মাথায় ডেকে আনলে তারা! যেদিন থেকে পুলিশে তারা খবর দিয়েছে, সেইদিন থেকেই এইসব উৎপাত শুরু হয়েছে। তার আগে তো কিছুই ছিল না!

ভাবতে-ভাবতে তরুণের মাথা গরম হ'য়ে ওঠে, ইচ্ছে হয়, দেওয়ালে মাথা কুটে মরে! এমনিভাবে তারা দু'জনে বন্দী হ'য়ে রইলো সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ··

এদিকে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হ'তে লাগলো। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় উদ্বেগ-আতঙ্কে একসময় তারা দু'জনেই নিস্তেজ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কতক্ষণ তারা এইভাবে ছিল কে জানে! হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদে তাদের ঘরটা যেন কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মত। দু'জনেরই ঘুম একসঙ্গে ভেঙ্গে গেল।

কোন্ হতভাগ্যের এই বুকভাঙ্গা কান্না? ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াতেই তারা একটা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পেলে, ওপরে ঠিক তাদের চোখের সামনে একটা ঘরে আলো জ্বলছে আর কতকগুলো লোক মুখোস প'রে একটা লোককে জোর ক'রে ধ'রে আছে—তার হাত-পা বাঁধা, সেই লোকটাই মধ্যে মধ্যে ওইরকম বিকট চীৎকার করছে।

ব্যাপারটা তখনো ভাল ক'রে বোঝা গেল না। একটু পরেই

তারা যা দেখলে তাতে তাদের সারা দেহ হিম হ'য়ে গেল। তরুণ তো কাঁপতে-কাঁপতে সেইখানেই পড়লো অচৈতন্য হ'য়ে। আর গৌরীশঙ্করবাবু তাঁর চোখ দু'টো দু'হাতে চেপে ধ'রে রইলেন। এমন বীভৎসভাবে মানুষ যে কখনো মানুষকে হত্যা করতে পারে তা' তাঁদের জানা ছিল না। তাই মৃত্যুর সে ভয়ঙ্কর রূপ তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না, যখন দেখলেন, একটা ছোট্ট চৌবাচ্চার মত লোহার পাত্রে ধূমায়িত সবুজ রংয়ের কি একটা তরল পদার্থ টল্‌টল্‌ করছে আর যেই সে-লোকটাকে তারা জোর ক'রে ধ'রে সেই চৌবাচ্চার মধ্যে ডোবালে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে সেই দীর্ঘাকৃতি লোকটা পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে একটা পুতুলের মত হ'য়ে গেল। সেটা যে একটা তীব্র এ্যাসিড তা' বুঝতে গৌরীশঙ্করবাবুর এতটুকু বিলম্ব হ'লো না। নিজেদের পরিণামের কথা ভাবতে গিয়ে তখন তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল।

সেদিন রাত্তিরটা ওইভাবেই কেটে গেল। তাঁদের কাছে কেউ এলোনা কিংবা একটা কথাও কেউ কইলে না তাঁদের সঙ্গে।

পরের দিন গভীর রাত্রে হঠাৎ সেই ঘরের চাবি খুলে চারটে মুখোসপরা লোক গৌরীশঙ্করবাবুকে ধ'রে

নিয়ে চ'লে গেল। তরুণের বুক টিপ্‌টিপ্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে সে যেন কিসের প্রত্যাশায় নিদ্রাহীন চোখে জেগে ব'সে রইলো।

পরের দিনটাও তেমনিভাবে কাটলো। তবে গভীর রাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় যখন তরুণের ইচ্ছা করছিল তার নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেতে—এমন সময় সহসা আবার যেন রঙ্গমঞ্চ সরগরম হ'য়ে উঠল। গৌরীশঙ্করবাবুর তীব্র চীৎকার তার কানে এসে লাগতেই সে যেমন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গেল অমনি মাথাটা ঘুরে প'ড়ে গেল। দেওয়াল ধ'রে-ধ'রে তখন সে আবার উঠে দাঁড়াতেই দেখলে, ঠিক পূর্ব্বের প্রথায় তারা গৌরীশঙ্করবাবুকে দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বাঁধছে। বজ্রাহতের মত তরুণ সেইদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন সে একটা মাটির পুতুল···তার কোনো অনুভূতি নেই···চৈতন্য নেই···

মিনিটখানেক পরেই তরুণের হাত-পা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দর্‌দর্ ক'রে ঘাম ঝরতে লাগলো। 'মাগো!' ব'লে ক্ষীণকণ্ঠে একবার চীৎকার করেই সে মাটিতে যেমন লুটিয়ে পড়লো, অমনি দ্র্যাম্-দ্র্যাম্-দ্র্যাম্ ক'রে তিনটে গুলির আওয়াজ হ'লো।

সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড়-দুড়দুড় ক'রে ওপরের লোকগুলো যে

মোহনসিংয়ের ফাঁস

যেদিকে পারলে ছুটে পালালো আর পিল্‌পিল্‌ ক'রে সশস্ত্র পুলিশ ও সার্জ্জেন্ট এসে সেই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটা জ্বলন্ত টর্চ্চের আলো!

মিনিটখানেক পরেই তরুণ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে। এ সেই পুলিশকমিশনারের কণ্ঠস্বর। সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না—তাঁর নাম ক'রে চেঁচিয়ে উঠল।

পুলিশকমিশনার সাহেব তখন কয়েকজন লোক নিয়ে সেই দরজাটা ভেঙে ফেলে তরুণকে উদ্ধার করলেন। ওদিকে আর-একদল ওপরে হানা দিয়ে ঘরে-ঘরে খানাতল্লাসী ক'রে শুধু গৌরীশঙ্করবাবুকে ছাড়া কাউকে পেলেনা। তিনি তেমনি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেই ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

তারা এসে তাঁকে মুক্ত ক'রে দিতে তখন তিনি যা-যা দেখেছিলেন একে-একে সব তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। সকলে মিলে তখন বাড়ীটা বারবার তন্নতন্ন ক'রে অনুসন্ধান করলে, কিন্তু বৃথা হ'লো সব পরিশ্রম। শেষে তরুণ ও গৌরীশঙ্করবাবুকে নিয়ে কমিশনার সাহেব সেই বাড়ী থেকে বেরুবার সময় একতলার একটা বন্ধ-ঘরের ভেতর থেকে একটা মিহি-সুরের গোঙানীর শব্দ শুনতে পেয়ে সেই ঘরের দরজা ভেঙে দেখলেন, হাত-পা বাঁধা অজ্ঞান অবস্থায় চেরী সেই ঘরের মেঝেয় পড়ে গোঙাচ্ছে।
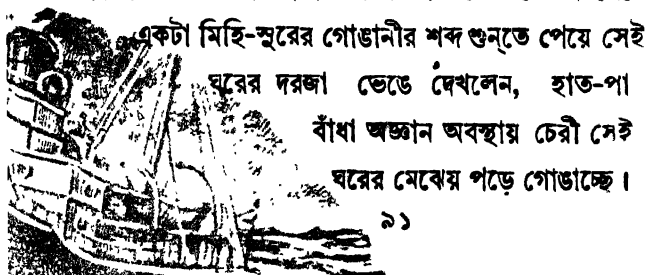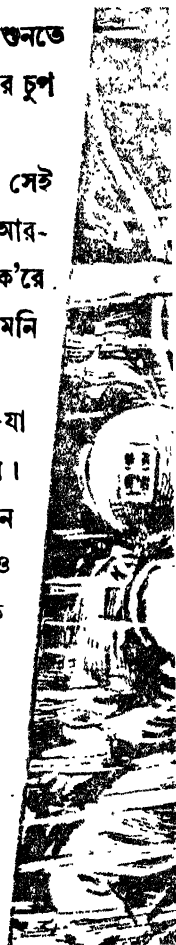
জয় ভগবান! ব'লে গৌরীশঙ্করবাবু চেরীকে কোলে তুলে নিতেই কমিশনার সাহেব বললেন, যত শীগগির পারা যায়, মেয়েটিকে নিয়ে আগে পৌঁছতে হবে এখন হাসপাতালে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে তরুণকে না নিয়েই যথাসময়ে গোয়েন্দাদল তাঁদের অভিযান শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। বোম্বাই থেকে তাঁরা বহু সুদক্ষ আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান ও বৃটিশ-সৈন্যসামন্ত নিয়ে, জাহাজ-বোঝাই গুলি-বারুদ, কামান ও আধুনিক জলযুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হ'লেন। ডক্টর লোহিয়ার অফিসে যে মানচিত্রটা পাওয়া গিয়েছিল তাই লক্ষ্য করেই তাঁরা চললেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের দেশী-বিদেশী যে-সব বিখ্যাত-বিখ্যাত গোয়েন্দা ছিলেন সকলেই সঙ্গে যাচ্ছিলেন, তবে ওই একটা জাহাজে নয়, আরো কতকগুলি ছোট-বড় দলে বিভক্ত হ'য়ে বিভিন্ন জাহাজে। ডুবো-জাহাজেও গোপনে-গোপনে অনেক গোয়েন্দা চলেছিলেন এবং উড়োজাহাজে ক'রেও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে কেউ-কেউ এগিয়ে গিয়েছিলেন।

:মাট কথা, এবার সেই দলটাকে সম্পূর্ণভাবে পাকড়াও করার ঙন্যে যতরকমের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সবই তাঁরা করেছিলেন। এবার সমুদ্রগর্ভে, সমুদ্রের :উপরে এবং শূন্যে কড়া পাহারা।

মানচিত্রে-চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে তখন তাঁরা অনেকগুলো দলে ভাগ হ'য়ে গেলেন এবং অতলে পাড়ি দেবার জন্যে ডুবুরীর পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, মহাসাগরের :সেই তুমুল তরঙ্গমালার উপর।

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর তাঁরা সেই স্থানটি আবিষ্কার করলেন এবং চারিদিক থেকে একেবারে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন।

এইভাবে আক্রমণের জন্যে দস্যুরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রথমটা তারা হতভম্ব হ'য়ে গেল। তাদের দলবল অধিকাংশই তখন কাজে নিযুক্ত ছিল সেই-জন্যে অপ্রস্তুত অবস্থায় কিছুক্ষণ লড়াই করেই তারা ধরা পড়লো। উভয়পক্ষে হতাহতও হ'লো কিছু। তারপর তাদের শৃঙ্খলিত করতে গিয়ে সকলে অবাক হ'য়ে গেলেন। দেখলেন, জাপান ও জার্ম্মাণীর বড় বড় নেতা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকজন। এই যুদ্ধের যারা নাম-করা সেনাধ্যক্ষ তাদের এইরকম স্থানে দেখে

তাঁরা প্রথমটা বিস্মিত হ'লেন, কিন্তু একটু পরেই তার কারণটা জানতে পারলেন।

তাদের বন্দী ক'রে একটা ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখে আরো কোনো মানুষ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা তাই অনুসন্ধান করতে গিয়ে সকলে আরো স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। দেখলেন, একটা চোরা-কুটরীর মধ্যে ব'সে আছে—আটজন বৈজ্ঞানিক। তাদের মধ্যে তিনজন জার্ম্মাণ, দু'জন জাপানী, একজন ইতালীয়, একজন চীন ও একজন বাঙ্গালী। তাদের সামনে বড় একটা টেবিলে বিরাট এক আলো জ্বলছে, আর ঘরের মধ্যে কতকগুলো যন্ত্রপাতি ঝক্‌মক্ করছে।

ভেতরে ঢুকে তাদের সকলের হাত আগে শিকল দিয়ে বেঁধে তারপর তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লো, তোমরা এখানে কেন সত্যি উত্তর দাও, তা' নাহ'লে কঠিন শাস্তি দেবো!

তারা দেখলে যখন আর মুক্তির কোনো আশা নেই, তখন মিথ্যে কথা ব'লে মিছিমিছি শাস্তির বোঝা না বাড়িয়ে বললে, আমরা এখানে এইসব গোলাগুলি তৈরি করছি।

প্রশ্ন হ'লো—কাদের জন্যে তৈরি করছো?

উত্তর—যারা কিনবে তাদেরই জন্যে। এ আমাদের ব্যবসা। এখানে পৃথিবীর সব জাত আসে—

জাপান আসে, জার্ম্মাণী আসে, চীন আসে, ইতালী আসে। যাদের যখন যে মারণ-অস্ত্রের প্রয়োজন হয় তারা তখন আমাদের কাছে আসে তা' কিনতে।

প্রশ্ন হ'লো—তোমরা কি শুধু মারণ-অস্ত্র তৈরি করো ?

উত্তর—হ্যাঁ।

বলার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন বাঙালী-গোয়েন্দা সেখানে ছুটে এসে বললেন, একটা ঘরের দেওয়ালে "ভি-ওয়ান" ও আর-একটা ঘরের দেওয়ালে "ভি-টু" লেখা রয়েছে। এছাড়া সোনা, রূপা, হীরা-জহরৎ যে কত রয়েছে তা' বলা যায় না! এক-একটা ঘরে যেন এক-একটা সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য !

তাই নাকি! ব'লে সকলে তখন বিস্মিতদৃষ্টিতে সেই বৈজ্ঞানিকদের মুখের দিকে তাকাতেই তারা গর্ব্বিতকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, জার্ম্মাণী "ভি-ওয়ান" "ভি-টু" প্রথম আমাদের এখান থেকে কিনে নিয়ে যায়—এক জাহাজ সোনা দিয়ে। আজ জার্ম্মাণী ওই অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রটি তৈরি করেছে ব'লে লোকের বিশ্বাস—কিন্তু আসলে ও তৈরি করেছি আমরা সকলে। আবার জাপান যেসব ভয়ানক-ভয়ানক অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করছে—যা লোকে কল্পনাও করতে পারে না—তাও আবিষ্কার করেছি আমরা !

তাহ'লে আজকের দিনে পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে অপরাধী আপনারা ! আপনাদের শাস্তি তাই এমন
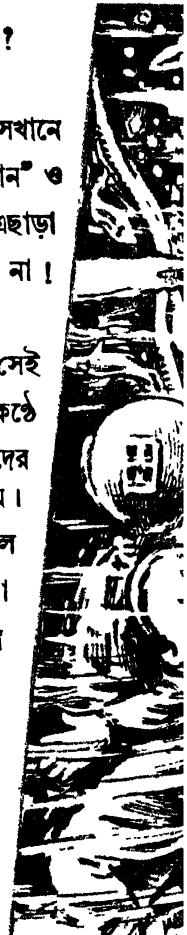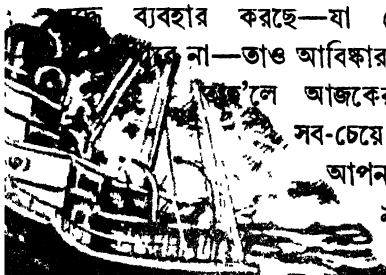
হওয়া উচিত যা পৃথিবীর লোক কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এই ব'লে আর কালবিলম্ব না ক'রে এঁরা সেই বন্দীর দলটাকে নিয়ে জাহাজে ক'রে প্রথমেই কলকাতায় রওনা হলেন। তারপর অন্যান্য জাহাজে সোনা, রূপা, হীরামুক্তা প্রভৃতি বোঝাই ক'রে আর-একদল তার পিছনে-পিছনে চললো।

কলকাতায় ফিরে আসতেই তাদের বিচার শুরু হ'লো। একমাস ধ'রে অনেক জেরা ও অনেক প্রমাণ-প্রয়োগের ফলে জানা গেল যে, ওই ব্যবসাটি মোহনসিং প্রভৃতি চারজন দস্যুর। তারা উচ্চ বেতন দিয়ে এইসব বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করেছে। আর যুদ্ধরত সব জাতকেই তারা গোপনে অস্ত্র বিক্রি করে। বিচারে স্থির হ'লো, অপরাধী সকলেই, তবে যারা এই মারাত্মক ব্যবসা ফেঁদেছে তারাই প্রধান! তাই কেবল মোহনসিং প্রভৃতি চারজন দস্যুর ফাঁসির হুকুম হ'লো এবং অন্য সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

কাগজে-কাগজে আবার হৈ-চৈ শুরু হ'লো। শহর গুলজার হ'য়ে উঠল—ফাঁসির দিন ঠিক হ'য়ে গেল। আবার চারজন আসামীর ছবি খবরের কাগজে ছাপা হ'লো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এদিকে তরুণ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে কলকাতায় এক বিরাট বাড়ী কিনে তার ওপর-তলায় নিজেরা বাস করতে লাগলো আর নীচেটা ভাড়া দিলে।

যেদিন তাদের ফাঁসি হ'লো, সেইদিন বিকেলে সব খবরের কাগজের অতিরিক্ত সংখ্যা বেরুলো। দেশবাসী সব উল্লসিত হ'য়ে উঠল—সেইদিনই ভোরে সেই দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত-সর্দ্দারদের ফাঁসি হয়েছে শুনে। শুধু তরুণ সেই খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে চুপ ক'রে তার ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে ব'সে রইলো।

ধীরে ধীরে অপরাহ্ণ মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার কলকাতার বড়-বড় বাড়ীর ওপর দিয়ে শহরের ওপর ঘনিয়ে আসতে লাগলো। এমন সময় সহসা তরুণ দারুণ আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠলো···যেন সে ভূত দেখেছে! তার সামনে দাঁড়িয়ে মোহনসিং···তার হাতে একটা রিভলভার!

মোহনসিং বললে, কেন তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে—কেন তুমি পুলিশে খবর দিলে?

তোমায় না আমি বারণ করেছিলুম? তোমায় ভালোবেসে সেদিন দয়া করেছিলুম ব'লে এই কি তার পুরস্কার?

তরুণের দেহ তখন ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। সে বললে, কিন্তু তোমার তো ফাঁসি হয়েছে—তুমি আবার বেঁচে উঠলে কি ক'রে?

মোহনসিং বললে, ঠিকই হয়েছে। যে মরেছে সে মোহনসিংই মরেছে। আবার যে তোমার সামনে বেঁচে রয়েছে, সেও মোহনসিং! এক-নামে কি দু'জন থাকতে নেই? এই ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠে সে বললে, ডিয়ার বয়, আমরা পাঁচজন মোহনসিং আছি···আশ্চর্য্য এই যে, সকলকেই একরকম দেখতে! তারপর হঠাৎ থেমেই গম্ভীরস্বরে আবার বললে, কিন্তু তুমি কেন এমন কাজ করলে, সেই কথা আগে বলো?

তরুণ সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলো।

মোহনসিং বললে, তোমার কান্নায় আমার মন আর গলাতে পারবেনা—তোমাকে আমি মেরে ফেলবো এখুনি এবং এখানে একটা চিঠি এই ব'লে লিখে রেখে যাবো যে, মোহনসিং নিজে হাতে তার প্রতিশোধ নিয়েছে!

এমন সময় সহসা তরুণের মা ছুটতে-ছুটতে ঘরে এসে পড়েই ছেলেকে ওই-অবস্থায় দেখে চীৎকার ক'রে
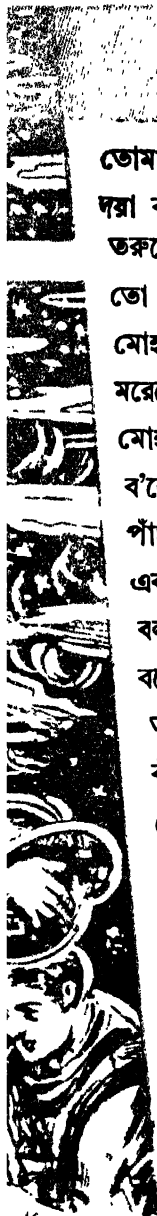
উঠলো। বন্দুকের নলটা সঙ্গে-সঙ্গে তার দিকে ঘুরিয়ে ধ'রে মোহন বললে, ফের যদি মুখে এতটুকু শব্দ করেছো ত' মেরে ফেলবো! তরুণের মা বললে, তাই করো। ওকে নয়, আমায় মারো— ওর কোনো দোষ নেই, আমিই ওকে মন্ত্রণা দিয়েছি পুলিশে খবর দেবার জন্যে।

এই বলতে-বলতে মোহনসিংয়ের সামনে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতেই তরুণের মা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তারপর একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে-দিতে বললে, এঁ্যা, তুমি এখনো বেঁচে আছো? তবে যে সবাই বললে, তুমি মরে গেছো, কাশীতে?

—মাধবী! তুমি? ব'লে উঠেই সে চুপ করলো। তারপর অস্ফুটস্বরে বললে, তবে কি তরুণ আমার ছেলে?

তরুণের মা কাঁদতে-কাঁদতে বললে, ওগো, হ্যাঁ। তুমি কাশীর গুণ্ডাদের সঙ্গে মিশে উচ্ছন্ন গেলে, আর আমাদের কোনো খবর নিলে না—তারপর একদিন এক টেলিগ্রাম এলো যে তুমি মরে গেছো, বসন্ত-রোগে। ব্যস্, সব ফুরিয়ে গেল। তারপর র'াধুনীগিরি ক'রে ছেলেকে মানুষ করছিলুম। তারপরে এই ব্যাপার ঘটলো। সরকার ওকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছে, তাতেই এই বাড়ী-ঘরদোর হয়েছে। এই ব'লে

চোখের জল মুছতে-মুছতে আবার বললে, কিন্তু তোমাকে আর আমি ছাড়বো না—যখন ভগবান একবার তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন তখন তোমাকে এখানে থাকতেই হবে।

মুহূর্ত্তে মোহনসিংয়ের চোখে জল এসে পড়লো…আনন্দে কি দুঃখে কে জানে! অভিভূতের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঈষৎ হেসে বললে, না, না—তা অসম্ভব।

মাধবী চিন্তিতমুখে প্রশ্ন করলে, কেন অসম্ভব!

মোহন বললে, চব্বিশ ঘণ্টা যে আগুনের মধ্যে বাস করছে তার পক্ষে এরকম কল্পনা করাও যে বাতুলতা! তুমি তা' বুঝতে পারবে না!

তরুণ এতক্ষণ চুপ ক'রে মোহনসিংয়ের মুখের দিকে চেয়েছিল! তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপছিল। সত্যি কি এই মোহনসিং তার বাবা! সে আর ভাবতে পারলে না। মাথার মধ্যে যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো।

তার বাপ মায়ের কথা শুনতে শুনতে সে হঠাৎ একেবারে মোহনসিংয়ের কাছে ছুটে গিয়ে তার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, বাবা, আমাদের ফেলে আর চ'লে যেয়ো না!

ছেলের মুখ থেকে এই কথা শুনে মোহনসিংয়ের সমস্ত অন্তর যেন

নিমেষে কোমল হয়ে পড়লো। অশ্রুসজল-চোখে সে তখুনি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আচ্ছা, আর যাবো না।

তরুণের মা'র মুখ এইবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোহনসিং বহুদিন পরে সংসারী হ'লো। স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। মানুষকে তা' ধীরে-ধীরে নিজের অজ্ঞাতে কেমন ক'রে যে নিত্য নতুন বন্ধনে জড়িয়ে ধরে তা' কেউ বুঝতেই পারে না! যে-জীবন সে এতদিন ধ'রে যাপন করেছে তার জন্যে আজ তার মনে অনুতাপ জাগে!

তরুণের দিকে চেয়ে সে ভাবে, একটা মাত্র ছেলে, তাকে লেখাপড়া শেখাবে, তাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তুলবে। আবার মাধবীর দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে, আহা, কত কষ্ট, কত দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করেছে মাধবী শুধু তারই অবহেলার জন্যে! এইসব ভাবতে ভাবতে মোহনের দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে উত্তাল হয়ে ওঠে! সে প্রতিজ্ঞা করে, এইবার থেকে সে নতুন-জীবন যাপন করবে—আরো দশজন যেমন সুখেস্বচ্ছন্দে সংসার করে।
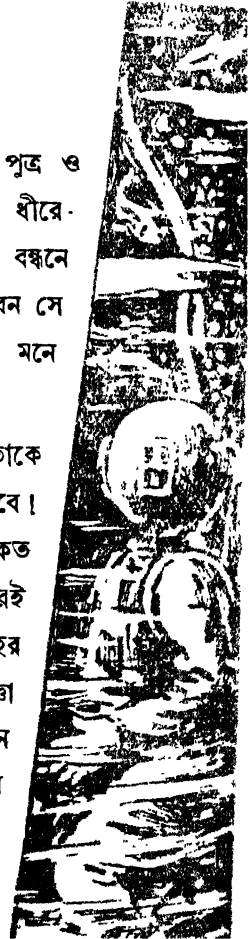
কিন্তু তবু কিছুতেই যেন সে সম্পূর্ণভাবে সংসারে মন দিতে পারে না! ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদূরে-মেঘ দেখলে ডরায়, তেমনি কোথাও একটু লাল-পাগড়ী দেখলে কিংবা পুলিশ-সম্পর্কিত কিছু দেখলেই তার বুকটা সহসা কেঁপে উঠতো—পুলিশের কাছে ধরা পড়বে ব'লে নয়, নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে আবার বিচ্ছেদ ঘটবে এই আশঙ্কায়!

তাই অতি সাবধানে সে চলাফেরা করে, আর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয় খুব হিসেব ক'রে। বেশভূষা চলন-বলন এমনভাবে মোহন বদলে ফেললে যে, তার দলের কোনো লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে সেও তাকে চিনতে পারতো না।

কিন্তু এত কাণ্ড ক'রেও বিশেষ সুবিধা হ'লো না। একবছর তখনো পার হয়নি একদিন মোহনসিং আর বাড়ী ফিরলো না। সে গিয়েছিল নিউমার্কেটে বাজার করতে। এদিকে সারা রাত কেটে গেল তখনো সে বাড়ী ফিরলো না দেখে তরুণ চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। সে জানতো যে, এ-রাজ্যে গোয়েন্দাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া একরকম অসম্ভব! তবুও বহুরূপী ছদ্মবেশী বাবার উপর তার অগাধ আস্থা ছিল। আসার বিলম্ব দেখে তরুণের মা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো, আর তরুণও এক্ষেত্রে কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো।

মোহনসিংয়ের ফাঁসি

এমন সময় লালবাজার অফিস থেকে একটি লোক এসে তরুণকে ডাকলে। তরুণের বুক কেঁপে উঠল। হাত-পা যেন অবশ হ'য়ে এলো। তবু মনের সমস্ত আশঙ্কা মুখের হাসি দিয়ে চাপতে-চাপতে সে নীচে নেমে এলো।

লোকটি একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে বললে, এখুনি আমার সঙ্গে আপনাকে বড় সাহেবের কাছে যেতে হবে, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

তরুণ আর দ্বিতীয় কথা না ব'লে তার সঙ্গে তখুনি চললো। পুলিশকমিশনারের ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু হেসে তরুণের সঙ্গে, 'হ্যাণ্ডসেক্' ক'রে বললেন, হ্যালো বয়, কেমন আছো? অনেকদিন তোমার কোনো খবর পাইনি ব'লে আজ ডেকে পাঠিয়েছি।

তরুণের বুকে এতক্ষণে যেন একটু সত্যিকারের বল ফিরে এলো। সে হেসে বললে, আমার বহু সৌভাগ্য যে, আপনি আজ আমায় নিজে ডেকেছেন। এরপর একটুখানি মামুলী-সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বড় সাহেব নিম্নতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, একটা লোককে এরা ধ'রে এনেছে সন্দেহ ক'রে, একে নাকি দেখতে অনেকটা মোহনসিংয়ের মত! তুমি ত' তাকে চিনতে ভালো করেই, তাই তোমায় ডেকেছি একবার দেখাবার জন্যে।

মোহনসিংয়ের ফাঁস

এই ব'লে সাহেব তরুণকে নিয়ে গেলেন, তার বাপকে যে-ঘরে আটক ক'রে রাখা হয়েছিল।

তরুণ তাকে দেখে সাহেবের ঘরে ফিরে এলো এবং হাসতে-হাসতে বললে, 'রামোঃ!' এই নির্জীব ভেতো-বাঙালী—একে যে মোহনসিং ব'লে সন্দেহ করে সে আস্ত পাগল!

সাহেব একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, আমিও তাই বলেছিলুম। তবু একটা 'স্পাই'এর মনে যখন সন্দেহ জেগেছে, আমাদের যা আইন আছে আমি তাই করলুম।

সাহেব তখন বললেন, ও-লোকটি নাকি তোমারই বাড়ীতে ভাড়া থাকে!

তরুণ বললে, হ'তে পারে। আমার বাড়ীতে পনেরো-ঘর ভাড়াটে থাকে। কে কখন আসে, কখন যায়—তা' একমাত্র সরকারমশায়-ই বলতে পারেন, আমি সেসব খবরও রাখি না।

সাহেব আর-একবার হ্যাণ্ডসেক্ ক'রে তাকে বিদায় দিতে-দিতে বললেন, মাই ডিয়ার বয়, তোমাকে এইভাবে কষ্ট দিলুম ব'লে কিছু মনে ক'রো না!

তরুণ হেসে বললে, এইভাবে মধ্যে-মধ্যে কষ্ট দিলে খুব খুশীই হবো! বহুদিন পরে তবু আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো!

* *

তরুণ বাড়ী গিয়ে দেখে, তার বাবা আর মা ঘরে ব'সে গল্প করছে!

শেষ